আমাদের ছুটি

৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

www.amaderchhuti.com

পৃথিবীর চূড়ায় - এভারেস্ট শিখরের কয়েক পা আগে
আলোকচিত্রী- শ্রী বসন্ত সিংহরায়

~ ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা - কার্তিক ১৪২০~

শরৎকালের মজাটাই হচ্ছে যেই শহরের উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে ঝকঝকে নীল আকাশ আর সাদা সাদা পেঁজা মেঘ চোখে পড়ে অমনি মনে হয় অন্য কোথাও যাই - পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল বা যেখানে হোক - কেউ যেন ডাক পাঠায়। আর অমনি ব্যাগ গুছিয়ে দে ছুট্। তবে ছুটব বললেই তো ছোটা যায়না। তাও ভাগ্যিস ট্রেনের টিকিট কাটার সময়টা কমিয়ে আবার দুমাস করেছে। নইলে মাঝেতো পুজোয় বেরোব ভাবলে প্রায় বছরের গোড়া থেকেই ভাবনা শুরু করে দিতে হত।

একেক সময় মনে হয় কেন একশ বছর আগে জন্মাইনি? এবার পুজোর ছুটিতে লুপ্ত হয়ে আসা অজন্তা গুহাচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হতে হতে আবারও সে কথাই মনে হচ্ছিল। পঞ্চাশ বছর আগে নারায়ণ সান্যালের দেখা বহু ছবিও আজ আর নেই। তবু এখনও যেটুকু আছে তা দেখতে পেয়েও নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হয়। এক নম্বর গুহায় সেই ছোটবেলায় ইতিহাস বইয়ের পাতায় দেখা পদ্মপানির ছবি নস্টালজিক করে তোলে। আমিতো সেই কবেই আসতে চেয়েছি...। তবে অজন্তাকে ঠিকমত অনুভব করা সম্ভব হত না নারায়ণ সান্যালের বইটি না থাকলে। বার বার পড়ার পর যখন ছবিগুলি চোখের সামনে দেখি তখন যেন মহাজনক জাতক, মহাকপি জাতক, ছদন্ত জাতক, বিধূর পণ্ডিত জাতক - একের পর এক গল্প শুনতে পাই নিজের মনেই। কাহিনির টানেই উনিশ নম্বর গুহার দ্বারে এসে খুঁজে নিই বুদ্ধের স্ত্রী-পুত্রকে ভিক্ষাপাত্র দানের মূর্তিটি। সতের নম্বর গুহার বারান্দার দেওয়ালের উঁচুতে ছেঁড়া ছেঁড়া অনেক ছবির মাঝে চিনতে ভুল হয়না অসামান্যা সুন্দরী কৃষ্ণা অপ্সরাকে। কিম্বা তাকিয়ে থাকি ছাব্বিশ নম্বর গুহায় শেষ শয্যায় শায়িত বুদ্ধের নীচে নিভে যাওয়া প্রদীপটির দিকে।

www.amaderchhuti.com

ইলোরায় আবার মুডটা একটু আলাদা - জমকালো, রাজকীয় ব্যাপার - বিরাট বিরাট সব মূর্তি। ষোল নম্বর গুহায় কৈলাস মন্দির দেখলে লালমোহনবাবুর মতোই বলতে হয় - স্তব্ধভাষ, রুদ্ধশ্বাস, বিমুগ্ধ, বিমূঢ়, বিস্ময়...।

মানুষের অত্যাচারে অজন্তার অধিকাংশ ছবিতো আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। এখনও যাচ্ছে, যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে আর নারায়ণ সান্যালের ভাষায় বললে মানুষের গন্ধে, ঘামে। ইলোরায় যথেষ্ট গার্ডের অভাবে লোকজন মূর্তির কোলে চড়ে ছবি তুলছে। বিবি কা মকবারার পিছনে ডানদিকে দেওয়ালে সিমেন্টের ওপর একটু লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে কেউ হাজরা লিখে রেখেছে। ভাবতেই শিউরে উঠতে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে এমন একটা দিন আসতে চলেছে যেদিন অজন্তায় শুধু শূন্য গুহাগুলোই পড়ে থাকবে। আমরা সত্যিই তাই চাই কি?

আনন্দ উৎসবের মাঝেই ওড়িষার সাইক্লোনের কথা জেনে আবারও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। আপতকালীন তৎপরতায় তা সামলানো গেছে এটাই সবথেকে ভালো খবর।

'আমাদের ছুটি'-র বন্ধুদের সবাইকে ঈদ আর বিজয়ার শুভেচ্ছা। ভালো থাকুন সকলে।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

*"সেই খোলা আকাশের নীচে শুয়ে আমার মনে হল আর ফিরতে পারব না। ওই অবস্থায় যদি আমি সারারাত পড়ে থাকি তার পরিণতিটা আমি ভালোভাবেই জানি... একটা হতাশার ভাব আসল - কিছুতো করার নেই, আমি উঠতে পারছি না, ওরা চলে গেছে...। কিন্তু সেটা খুব বেশিক্ষণ থাকল না। তারপরেই মনে হল, আমার কিছু হবে না, আমি বাঁচব।' - দীর্ঘ চব্বিশ-পঁচিশ বছর ধরে পাহাড়ই ধ্যান-জ্ঞান এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্নপূর্ণা সহ আঠারটি শৃঙ্গজয়ী বসন্ত সিংহ রায়ের। ধৌলাগিরি অভিযানে প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পর এতদিনে মিলল ভারত সরকারের তরফে 'তেনজিং নোরগে অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার' এবং রাজ্য সরকারের তরফে 'রাধানাথ সিকদার ও তেনজিং নোরগে পুরস্কার'। বেঁচে ফেরা এবং পুরস্কার পাওয়া এই দুই বিপরীত অনুভূতির কথা উঠে এল**বসন্তদার সঙ্গে আমাদের ছুটির আড্ডায়।***

~ আরশিনগর ~

ঘনাদার শ্বশুরবাড়িযাত্রা - অথঃ কোচবিহারকথা - রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

www.amaderchhuti.com

~ সব পেয়েছির দেশ ~

স্বপ্নের দেশে কয়েকদিন - সুমিতা সরকার

ঢাকা থেকে সিমলা - তুহিন ডি. খোকন

আকাশ আমায় ভরল আলোয় - অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

অপার্থিব – প্রোজ্জ্বল দাস

ছেড়ে চেনা রুট – ঝুমা মুখার্জি

~ ভুবনডাঙা ~

পুজোয় প্রবাসে – মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

আমেরিকার 'কার্নিভাল স্প্লেনডর' ও কলকাতার বনানীদি – বনানী মুখোপাধ্যায়

www.amaderchhuti.com

~ শেষ পাতা ~

রহস্যময় আন্ধারমানিক – জিয়াউল হক শোভন

মন্দির নগরীতে কিছুক্ষণ – রিমি মুৎসুদ্দি

ইচ্ছে হল – দেবশ্রী ভট্টাচার্য

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

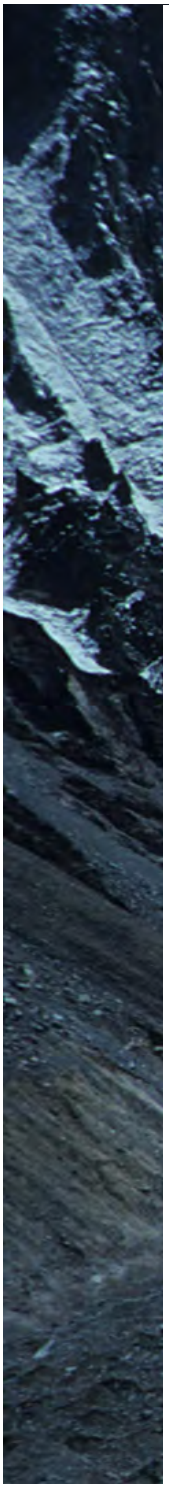

-->

কথোপকথন

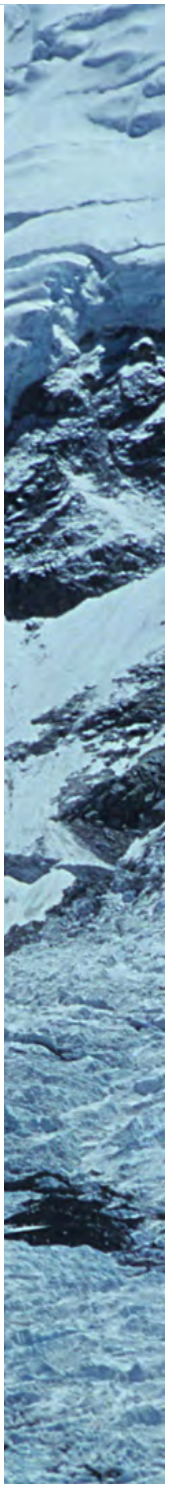

[১৯৮৯ সালে উত্তরকাশীর এন.আই.এম. থেকে 'এ' গ্রেড সহকারে প্রাথমিক এবং অ্যাডভান্সড কোর্স করার পর থেকে দীর্ঘ চোদ্দ-পনের বছর বসন্ত সিংহরায়-এর কেটেছে পাহাড়ে পাহাড়েই। মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন অফ কৃষ্ণনগরের একেবারে প্রথম দিককার সদস্য বসন্ত-র প্রথম অভিযান এবং সামিট ১৯৯০ সালে গ্যাংস্ট্যাং শৃঙ্গ। ১৯৯১ সালে কুমায়ুনের বালজুরি শৃঙ্গ অভিযান থেকে দলের নেতৃত্বে রয়েছেন। ২০১০ সালে সহ অভিযাত্রী দেবাশিস বিশ্বাসের সঙ্গে প্রথম অসামরিক বাঙালি হিসেবে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়। এর পরের বছর কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং ২০১২-য় অন্নপূর্ণা শৃঙ্গ জয়। সব কটি অভিযানেই সঙ্গী ছিলেন দেবাশিস। এর আগে উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গ জয়ের মধ্যে রয়েছে কামেট (১৯৯৭), চৌখাম্বা (১৯৯৮), শিব (২০০২),দেওটিব্বা (২০০৩), ইন্দ্রাসন (২০০৪), শিবলিঙ্গ (২০০৫), থলয় সাগর (২০০৮)। ২০১১ সাল থেকে ২০১৩-র এপ্রিল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মাউন্টেনিয়ারিং ও অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের যুবা বিভাগের সম্মানীয় উপদেষ্টা ছিলেন। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে গাড়োয়ালের বিপর্যয়ে এবং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে সিকিমের মঙ্গনের ভূমিকম্পে আটকে পড়া পর্যটক এবং অভিযাত্রীদের উদ্ধারকার্যে নিয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্ধারদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সম্প্রতি ভারত সরকারের তরফে তাঁকে 'তেনজিং নোরগে অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার'-এ সম্মানিত করা হল। এর ঠিক পরপরই পেলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে 'রাধানাথ শিকদার ও তেনজিং নোরগে পুরস্কার'।]

www.amaderchhuti.com

বসন্ত সিংহরায় এবং দেবাশিস বিশ্বাসের নামের সঙ্গে আমার পরিচয় ২০১০ সালে, প্রথম অসামরিক বাঙালি হিসেবে এভারেস্ট জয়ের সংবাদ থেকে। তখনও 'আমাদের ছুটি'-র জন্ম হয়নি, প্রস্তুতি পর্ব চলছে। ২০১১ সালের মে মাসে পত্রিকা প্রকাশের ঠিক আগে আগেই দীপঙ্কর, রাজীব আর মুহিত এভারেস্ট অভিযান সেরে ফিরে এসেছেন। ভেবেছিলাম এই দু'বছরের দুই বাংলা মিলিয়ে ছ'জন অভিযাত্রীর একটা জমাটি আড্ডা নিয়ে লেখা যাবে। কিন্তু বসন্ত সিংহরায়, দেবাশিস বিশ্বাস বা মুসা ইব্রাহিমের সঙ্গে তখন যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। তাই সেবছরের তিন অভিযাত্রীকে নিয়েই আমাদের কথোপকথনের আড্ডা জমিয়েছিলাম। পরবর্তীতে 'আমাদের ছুটি'তে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান নিয়ে লেখাটির সূত্রেই প্রথম দেবাশিসদার সঙ্গে আলাপ হয়। তারপরে এই সদাহাস্যময় সদালাপী বন্ধুবৎসল মানুষটিকে পাই পত্রিকার একবছরের অনুষ্ঠানের জমাটি আড্ডায়। বসন্ত সিংহরায়ের 'তেনজিং নোরগে অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার' পাওয়ার পর দেবাশিসদার আমন্ত্রণেই গত ৭ সেপ্টেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে কৃষ্ণনগর মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত হয়েছিলাম। সেদিন বসন্ত সিংহরায়ের কণ্ঠে তাঁদের অভিযানের বর্ণনা শুনে রীতিমত মুগ্ধ হলাম। তারপর তাঁকে পেলাম আমাদের কথোপকথনের আড্ডায়। মিতভাষী, স্নেহময় মানুষটি ততক্ষণে হয়ে উঠেছেন বসন্তদা। আড্ডার ফাঁকেই দেবাশিসদার কাছে শুনলাম প্রথম আলাপ থেকে ধৌলাগিরি অভিযান - বসন্তদার সঙ্গে কাটান নানান অভিজ্ঞতার কথাও।

~ পর্বতারোহণের আরো ছবি - বসন্ত সিংহরায় || দেবাশিস বিশ্বাস ~

◆ বসন্তদা, ভারত সরকারের 'তেনজিং নোরগে অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার' পাওয়ার জন্য প্রথমেই 'আমাদের ছুটি'-র পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।
কৃষ্ণনগর মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাব আয়োজিত সম্বর্দ্ধনা সভায় ধৌলাগিরি অভিযানের কথা শুনতে শুনতে অদ্ভুত একটা ইন্সপিরেশন পেলাম। ওই যে আপনি বলছিলেন ৭০০০ মিটারেরও অনেক ওপরে খোলা আকাশের নীচে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে একা একা একটা রাত কাটানোর কথা - অক্সিজেন নেই, জল নেই, শরীরে কোন শক্তিও নেই নীচে নেমে আসার মত, অথচ তখনও আশা ছাড়েননি, বেঁচে থাকার তীব্র ইচ্ছাটাই সবকিছু ছাপিয়ে সত্যি হয়ে উঠেছিল। এটা কিন্তু যেকোন মানুষকেই উদ্বুদ্ধ করবে। সেদিনের অভিজ্ঞতার কথা দিয়েই শুরু করি আমাদের আড্ডা।

. বসন্ত - ধৌলাগিরিতে আমরা ২১ তারিখ তিন নম্বর অর্থাৎ লাস্ট ক্যাম্পে পৌঁছেছিলাম। সেখান থেকে আমরা ২২ তারিখ সামিট করতে বেরোই। আবহাওয়া খারাপ থাকায় স্প্যানিশ একটা দল ছাড়া অন্য সবাই নীচে নেমে গিয়েছিল। দু'জন মেম্বার আর শেরপা, তিনজনের সেই দলটা রাত দশটার সময় বেরিয়ে পড়ল। হাওয়া তখন অল্প চলছিল। খানিক আলাপ-আলোচনার পর আমরাও সিদ্ধান্ত নিলাম যাব। সাড়ে দশটা-পনে এগারটা নাগাদ ক্লাইম্ব করতে শুরু করলাম। প্রথমেই খাড়া দেওয়াল ধরে উঠছিলাম, বরফে দড়ি লাগানো ছিল। বেশ কিছুটা উঠে এসেছি ২০০-২৫০ মিটার মত। এখানে ছিল চার নম্বর ক্যাম্প। এক জাপানি মহিলা সিজোকো কোকো, ষাটষট্টি বছর বয়স, সে একটু ওপরে এই ক্যাম্প করেছিল। তিন নম্বর ক্যাম্প থেকে ধৌলাগিরির সামিটটা অনেক বেশি সময় লাগবে। তাসত্ত্বেও ভালো জায়গা নেই দেখে আমরা ভেবেছিলাম সেখান থেকেই বেরোব। জাপানি মহিলার তাঁবু পর্যন্ত উঠে দেখলাম ওরাও বেরোচ্ছে ক্লাইম্ব করতে। আমার আর দেবাশিসের সঙ্গে মলয় মুখার্জি বলে আরেকটি ছেলে ছিল। শরীর পুরো সুস্থ না থাকায় মলয় খুব আস্তে আসছিল। আমাদের শেরপা পেম্বা বলল এই রাস্তা আসতেই ওর আরও একঘন্টা সময় লাগবে। আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে ওকে এখান থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে। রাতটা ও একজন শেরপার সঙ্গে জাপানি মহিলার তাঁবুতে থেকে সকালে আমাদের তিন নম্বর ক্যাম্পে ফিরে যাবে। আমি, দেবাশিস আর দু'জন শেরপা পেম্বা আর পাশাং ক্লাইম্ব করছি। আমাদের ওপরে স্প্যানিশ দলের শেরপা সহ তিনজন এবং ওই জাপানি মহিলা ও তার সঙ্গে দুজন শেরপা - এই মোট দশজন আমরা ক্লাইম্ব করছি।

রাত শেষ হল, সকাল হল, আমরা ক্রমশ ওপরে উঠছি। মাঝে মাঝেই বেশ হাওয়া চলছে, ধুলোর ঝড়ের মতো বরফগুঁড়ো গায়ের মধ্যে লাগছে। এর জন্য আমাদের ওঠার গতিটা কমে যাচ্ছিল। আমরা এই পথে দড়ি লাগিয়ে যাইনি, ফলে কঠিন জায়গাগুলোতেও সময় লেগে যাচ্ছিল। যে আগে যাচ্ছে, তাকে খুব সাবধানে যেতে হচ্ছে। কখনও আমরা আগে যাচ্ছি, কখনও সেই জাপানি মহিলা কখনওবা স্পানিশ দলটি। আমরা সবাই একেকটা দলে রোপ আপ করে চলেছি। আমরা চারজন একটা দড়িতে, জাপানি মহিলারা একটা দড়িতে তিনজন, স্প্যানিশ দলটির একজন আর শেরপাটি একটা দড়িতে বাঁধা আছে, ওদের লিডার ভদ্রলোকটি একা একা পেছনে আসছে।

যেতে যেতে বেলা গড়িয়ে গেল - প্রায় তিনটে, তখনও আমাদের কিছুটা বাকী আছে, মোটামুটি ঘন্টাদুয়েক লাগবে, আনুমানিক একশো মিটার নীচে আছি। হঠাৎ স্প্যানিশ ভদ্রলোকের শেরপাটি স্লিপ কেটে গেল। স্লিপ খেয়ে একেবারে ফুটবলের মতো রাউন্ড খেতে খেতে পড়ছে। আর ও যেই পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে

ওর সঙ্গে বাঁধা স্প্যানিশ ভদ্রলোকও পড়ে গেলেন। দুজনেই রোল করছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমরা ভাবছিলাম ওরা বেরিয়েই যাবে, কিন্তু যাইহোক হঠাৎ শেরপাটা আটকে গেল। স্প্যানিশ ভদ্রলোকও শেরপাটির গায়ে ধাক্কা খেয়ে আটকে গেল। তখন আমরা পুরো হতভম্ব হয়ে গেছি, বেলাও হয়ে গেছে, ঠিক করলাম এখান থেকেই ফিরে যাব। দেখি জাপানি মহিলা ইউ টার্ন নিয়ে নিয়েছেন। ইতিমধ্যে স্প্যানিশ দলের শেরপাটি উঠে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ভদ্রলোকটি উঠতে পারছে না। ওদের লিডারও ততক্ষণে চলে এসেছে। দুজনে স্প্যানিশ ভাষায় কী কথা বলছে আমরা বুঝতে পারছি না। দেখলাম যে ওরা সেফ - মারা যায়নি, রেসকিউ করতে হবে। শেরপাটা ঠিক আছে, নিশ্চয় নিয়ে আসতে পারবে। আমরা ফিরতে শুরু করলাম।

এভারেস্ট বেসক্যাম্পে শ্রী বসন্ত সিংহ রায়

ফিরতে ফিরতেই চোখে একটু ঝাপসা দেখতে শুরু করেছিলাম। গগলসের ওপর তুষার জমে শক্ত বরফ হয়ে যাচ্ছে। সেগুলো পরিস্কার করা যাচ্ছিল না। তখন চশমাটা পালটে শেরপার কাছে বাড়তি চশমা ছিল সেটা পড়লাম। দেবাশিসেরও চোখে অসুবিধা হচ্ছিল। যাইহোক সন্ধ্যা হয়ে গেল, আমরা নামছি আস্তে আস্তে। হেডটর্চ জ্বালিয়ে আসছি। দেবাশিসের হেড টর্চের আলোটা কমে গেল। ও বলল বসন্তদা তোমারটা দাও। আমি সিনিয়র, দলনেতা, স্বাভাবিকভাবে আমি আমার টর্চটা ওকে দিয়ে দিলাম। এবারে আমি আর কিছু দেখতে পারছি না। একেই চোখটা খারাপ হয়েছিল, তারপরে অন্ধকারে কিচ্ছু দেখতে পারছি না, আন্দাজে নামছি। এবারে রাত তখন আটটা-ন'টা হবে, দেবাশিস একটা জায়গায় এসে 'বসন্তদা...' বলে বসে পড়ল। দেখলাম যে ও আর পারছে না। এর আগে কাঞ্চনজঙ্ঘাতেও একবার এরকম অবস্থা হয়েছে, অন্নপূর্ণাতেও একজায়গায় একটুখানি হয়েছিল। আসলে ওর অক্সিজেন ফুরিয়ে গেছে। এদিকে আমারও অক্সিজেন ফুরিয়ে গেছে। সেইজন্যই যখন নামছিলাম, টলে টলে যাচ্ছিলাম। আমাদের এতটা সময় লাগবেতো ভাবিনি। রাত দশটা-এগারটায় বেরিয়েছি, পরেরদিন দুটো-তিনটে-চারটের মধ্যে ফিরে আসার কথা আমাদের তাঁবুতে।

এবারে দেখি আমারও আর শরীর চলছেনা। বসে পড়লাম পথের ওপরেই। আর উঠতে পারছি না। মনে হল আমি যদি না উঠতে পারি তাহলে আর কী হবে - হয় মরতে হবে নয়তো পিঠে করে নামাতে হবে। পাশাংকে বললাম আমাকে পিঠে করে নামাও। এটা প্র্যাকটিকালি সম্ভব নয় - কোনো শেরপা কাউকে পিঠে করে উপরেও নিয়ে যেতে পারে না, নীচেও নামিয়ে আনতে পারে না, একটু-আধটু হতে পারে। বিশেষ করে ওই উচ্চতায়তো সম্ভবই নয়, তখন আমরা ৭৮০০-৯০০ ফিট ওপরে। তখন কিছুটা সময় গিয়েছে, পেম্বা দেবাশিসকে বুঝিয়েছে যে যদি না নামে তাহলে এখানেই মরতে হবে, আর কিছু উপায় নেই। আমি শুনতে পাই নি অবশ্য। দড়িটা কেটে নিয়ে একটা দড়িতে পেম্বা নিজেকে আর দেবাশিসকে বেঁধে নামতে লেগে গেল। নামার আগে আমাকে কিছু না বলে একবার করুণ চোখে তাকিয়ে পেম্বা চলে গেল। পাশাং তখনো আমার সামনেই দাঁড়িয়ে। এরপর পাশাং-ও নেমে যাচ্ছে দেখে ওকে বললাম, তুমি আমার সঙ্গে থাক। বলল, না, আমি সকালবেলায় আসব। ও নেমে যাওয়ার পর সেই খোলা আকাশের নীচে শুয়ে আমার মনে হল আর ফিরতে পারব না। ওই অবস্থায় যদি আমি সারারাত পড়ে থাকি তার পরিণতিটা আমি ভালোভাবেই জানি। বেসক্যাম্পেই যদি ওরকম ঠান্ডার মধ্যে বাইরে পড়ে থাকতে হয় তাহলে মরে যাওয়ার মত অবস্থা হয়। একটা হতাশার ভাব আসল - কিছুতো করার নেই, আমি উঠতে পারছি না, ওরা চলে গেছে...। কিন্তু সেটা খুব বেশিক্ষণ থাকল না। তারপরেই মনে হল, আমার কিছু হবে না, আমি বাঁচব। আমি এত ভাল পোষাক পড়ে আছি, পায়ে জুতো, হাতে গ্লাভস আছে, আমার কিচ্ছু হবেনা। হার্টবিটটা মাঝে মাঝে অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে, তখন মনে হচ্ছে যেন হার্ট ফেল করবে। মনের যতই জোর থাকুক, হার্ট কাজ না করলেতো আমার কিছু করারও নেই। তাহলে কি হার্টফেল করেই মারা যাব? তাও মনে হচ্ছে, না, কিছু হবে না। এটা আমার জীবনের একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা, এটাকেই আমি এনজয় করি। আরেকটা কথাও মনে হল যে কোনরকমে আমায় রাতটুকুনি কাটাতে হবে। সকাল হলেই যে শেরপাটাকে আমরা তিন নম্বর ক্যাম্পে নামিয়ে দিয়েছিলাম ও এসে আমাকে অক্সিজেন দিয়ে নামিয়ে নিয়ে যাবে। এদিকে খুব জল পিপাসাও পেয়েছে। এসব ভাবতে ভাবতেই চোখে পড়ল দূরে একটা পাশে আলো জ্বলছে। বুঝলাম সেই জাপানি মহিলা ও তার শেরপারা। ওরা ঠিক রাস্তায় না নেমে একটু অন্যদিকে চলে গেছে। আমার লাইটটা তখন ওদের দিকে অনেকবার করে ঘোরালাম যাতে এদিকে আসে। কিন্তু ওরা কোথায় গেল বুঝতে পারলাম না, আমিও তারপরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে প্রচণ্ড জল পিপাসায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। হাতের গ্লাভস খুলে বরফ একটু খুঁটে খুঁটে মুখে দিলাম। জিভে হয়তো সামান্য একটু লেগেছে, কিন্তু তেষ্টা মেটেনি। তারপরে কোনমতে ওপরের মোটা গ্লাভসটা পরলাম কিন্তু তলার পাতলা গ্লাভসটা আর পরতে পারলাম না।

www.amaderchhuti.com

কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর থেকে

যাইহোক সারারাত পড়ে থাকার পর একটা সময় দেখলাম সূর্য উঠছে। লাল একটা আভা - সরলরেখায় একটা লাইন হয়, এটা গত কয়েকবছর ধরেই দেখছি - এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, অন্নপূর্ণায়। ভোরবেলায় এই লাল সরলরেখাটা আস্তে আস্তে গোলাপি হয়ে যায়, তারপরে সূর্য ওঠে। তখন মনে হল অনেকটা সময় কেটে গেছে, তারমানে এবার ভোর হবে, সকাল হবে, সূর্য উঠবে, আমি বাঁচব। সূর্য উঠলে ঠান্ডাটাও কিছুটা কমবে। ভগবানের আশীর্বাদ কীনা জানি না, রাতে একটুও হাওয়া দেয়নি, একটা ফোঁটাও বরফ পড়েনি, যেটা ওই উচ্চতায় স্বাভাবিক। আবার একটু ঘুমিয়ে গেছি। তারপর ঘুম ভাঙতে দেখছি একজন উঠে আসছে। আমি তাকে দেখে বাঁহাতটা নাড়াতে লাগলাম - একতো খুশিতে, আর আরেক হল তাকে বোঝানো যে আমি বেঁচে আছি, তুমি এস। ভয় পেতে পারেতো আমি মরে গেছি ভেবে। দেখি পাশাং। পরে জানতে পারি ও সে রাতে ক্যাম্পে নেমে যায়নি। কিছুটা নেমে একটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল। ও আসার পর ওকে বললাম তোমার কাছে আমার ক্যামেরা আছে, ছবি তোল। আমি নিজেও শুয়ে শুয়ে অনেকগুলো ছবি তুললাম। ওকে বললাম ওখানে অক্সিজেনের বটল কয়েকটা পড়ে আছে, তার কোনটায় অক্সিজেন আছে কীনা দেখতে। ও সবগুলোতেই রেগুলেটর লাগিয়ে দেখল যে কোনটাতেই নেই। জলও নেই ওর কাছে। তারপরে আর আমার তেমন কিছু মনে নেই, ও কিছু বলেওনি আমাকে। নেমেও গেল কিছুক্ষণ পর। আমি তখনও অপেক্ষা করে আছি সেই শেরপাটা আমাকে নিতে আসবে। তারপর দেখি ওপর থেকে সেই স্প্যানিশ দলনেতা নেমে আসছে। ওর নাম জুয়ান জু। ওর দলের অন্যজনকে শেরপাটা কিছুটা নামিয়ে আর পারেনি, অ্যাঙ্কেলে চোট লেগেছে। জিজ্ঞাসা করলাম জল আছে? ও বোতলটা উলটে দেখাল একফোঁটাও নেই। স্বাভাবিক, ও-ওতো বেরিয়েছে দুদিন আগে রাত দশটায়। ও আমার পাশ দিয়েই নেমে গেল। আমিতো শুয়েই আছি, শরীরে কোন শক্তি নেই। তারপরে হঠাৎ দেখি আরেকজন উঠে আসছে - সেই শেরপাটা, ওর নাম দাওয়া। দাওয়া এসে অক্সিজেন দিল। ওয়াকিটকিতে দেবাশিসদের সঙ্গে কথা বললাম। ওরাতো আশাই করেনি, ভেবেছিল আমি এক্সপায়ার করে গেছি। ওরা বলছে তুমি নেমে এস। বললাম, আমাকে পিঠে করে নামাতে হবে, হাঁটার অবস্থা নেই। ওরা বলছে সেতো সম্ভব নয়, তুমি যে করে হোক নেমে এস। বাড়ির কথা বলছে, ছেলের কথা বলছে...। কিন্তু আমার পক্ষে নামা সম্ভব নয়। ফোনটা কেটে দিলাম। আমি দাওয়াকে বললাম তুমি আমাকে পিঠে তোল। ও পিঠে তুলে সাত-আটটা স্টেপ নেমেই আবার আমাকে নামিয়ে দিয়েছে। ওর কষ্ট হচ্ছে। তারপর আবার তুলেছে। যেই তুলেছে তখন আমার বুকে পেইন হচ্ছে। আমি ওকে বললাম নামিয়ে দাও। তারপরে আর ওর পিঠে উঠিনি। কখনও বসে বসে, কখনও কুঁজো হয়ে কয়েকটা স্টেপ...সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম না, কখনও আমি গা ছেড়ে দিচ্ছি ও স্লিপ কাটিয়ে কাটিয়ে নিয়ে এসেছে। এভাবে সারাদিন চলে বিকালবেলায় সেই জাপানি মহিলার তাঁবুতে যেখানে দেবাশিস আছে সেখানে দাওয়া আমাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। তারপর চা বা ওই জাতীয় গরম কোন তরল খেতে দিল। সারারাত জাপানি মহিলার ছোট স্লিপিং ব্যাগে শুয়ে খুব শীত করছিল, কষ্ট হচ্ছিল, খুব কথাও বলছিলাম, অবুঝের মত রাগারাগি করছিলাম। পরেরদিন সকালে আবার নেমেছি - অনেকটাই স্লিপ কেটে, ওরা

ধরেছিল, আমার তেমন জোর ছিল না, তবে অক্সিজেন থাকায় কষ্টটা কিছুটা কম হচ্ছিল। কোনমতে তিন নম্বর ক্যাম্পে পৌঁছানোর পর দেখছি ওরা আমায় ম্যাট্রেস দিয়ে বাঁধছে, কেন বাঁধছে কিছু বুঝতে পারছিনা। দেবাশিসকে বলছি আমাকে তাঁবুতে ঢোকাচ্ছে না কেন? মলয় ক্যামেরা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, ওকে বললাম ছবি তোলো। তারপর হঠাৎই শুনি একটা আওয়াজ - হেলিকপ্টারের শব্দ আর তারপরেই দেখি আমি ঝুলছি। ঝুলছি, হাওয়া লাগছে, অস্বস্তি করছে, তবে দু'তিন মিনিটও হবেনা, দেখি বেসক্যাম্প। আমার আলসার হয়ে গিয়েছিল। সেদিনই আবার ওই হেলিকপ্টারে আমাকে কাঠমান্ডু পাঠান হয়। সেখানে নেমে সোজা আই সি ইউ-তে। এর মাঝে অনেক কথা আমার মনে নেই, গ্যাপ রয়ে গেছে স্মৃতিতে, কোনদিনও আদৌ মনে পড়বে কীনা কে জানে! পরে জানতে পারি ওই জাপানি মহিলাকে আমি দূরে যেখানে আলো দেখেছিলাম ওখানেই তার অক্সিজেন ফুরিয়ে যায় আর এক্সপায়ার করে। স্প্যানিশ ভদ্রলোকটি তিনরাত লড়াই করেছিল। তারপর চতুর্থদিন যখন নীচের থেকে অক্সিজেন ওষুধ নিয়ে রেসকিউ টিম পৌঁছেছে, তখন মারা গেছে। সেই শেরপাটাকে নামিয়ে নিয়ে এসেছে।

◆ দেবাশিসদা, আপনিতো দীর্ঘ সময় ধরে বসন্তদার পাহাড়পথের সঙ্গী, কিন্তু এবারের মত অভিজ্ঞতা হয়তো আগে কখনও হয়নি। যখন নীচে পৌঁছে দেখলেন বসন্তদা আসেনি তখন খুব খারাপ লাগছিল নিশ্চয়। সেইসময়ের পরিস্থিতি ঠিক কেমন ছিল?

□ দেবাশিস - ঠান্ডা লেগে চোখে ঝাপসা দেখতে দেখতে একসময় আর কিছুই দেখতে পারছিলামনা। ফলে বুঝতেই পারিনি যে যেখানটায় আমরা আলাদা হলাম সেখানে বসন্তদা বসে গেছে। আমার মাথায় তখন একটাই ভাবনা যে ওই জাপানি মহিলার তাঁবুটা যেখানে ছিল, আমাদের তাঁবুর দুশো মিটার ওপরে, সেখানে পৌঁছাতে হবে। সারারাত ধরে হাঁটছিতো হাঁটছি। তারপর কোন একসময় সেখানে পৌঁছালাম। পেম্বা বলল, দেবাশিসদা পৌঁছ গিয়া। আমরা যখন আলাদা হয়ে নামতে শুরু করেছিলাম তখন পেম্বাকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম সাড়ে সাতটা বাজে। আমি ভেবেছিলাম সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা, আসলে সেটা পরেরদিন সকাল সাড়ে সাতটা। তাঁবুতে ঢুকে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। মনে হল যেন মারাই যাচ্ছি, চোখের সামনে নানান রঙ দেখছি। তাঁবুর ভেতরে কেউ আমাকে টেনে নিল, আমার মনে হল বোধহয় বসন্তদা। আসলে জাপানি মহিলার একজন শেরপা ছিল - দাওয়া, সেই আমাকে টেনে নিয়েছিল। কেউ একটা গরম কোন তরল আমাকে খাইয়ে দিল। প্রায় ঘন্টাদুয়েক ওভাবে আচ্ছন্ন অবস্থায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে চোখ খুললাম। আবছা আবছা আলো দেখতে পাচ্ছি। তখন খেয়াল করলাম বসন্তদা নেই।

ধৌলাগিরি অভিযানে বসন্ত সিংহ রায়কে নামিয়ে আনছে শেরপারা

পেম্বাকে জিজ্ঞাসা করলাম বসন্তদা কোথায়। বলল, বসন্তদাতো উপর রহ গিয়া, উসকো জিন্দা আনা মুসকিল হ্যায়। পেম্বা এরমধ্যে ওয়াকিটকিতে আমাদের তাঁবুতে যোগাযোগ করেছিল। ওখানে মলয় আর ওর শেরপা দাওয়া ছিল। দাওয়াকে মলয়ের অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে আর একটু জল বানিয়ে ওপরে বসন্তদার কাছে যত সকালে সম্ভব পৌঁছাতে বলেছিল। আমি যখন খেয়াল করতে পারলাম ততক্ষণে পাসাং নেমে এসেছে, দাওয়া বসন্তদার কাছে পৌঁছে গেছে। ওখান থেকে ওয়াকিটকিতে জানিয়েছে, বসন্তদা মিল গয়া, ও ঠিক হ্যায়, লেকিন চল নেহি সকতা। আমি তখন বসন্তদার সঙ্গে কথা বললাম - তোমার বাড়িতে বৌদি আছে, ছেলে আছে, ওদের কথা ভাব, মনে জোর আনো, উঠে দাঁড়াও। বসন্তদা কেবল একটাই কথা বলছে, আমাকে পিঠে করে নামাতে হবে। কিন্তু ষাট-পঁয়ষট্টি কেজি একজনকে পিঠে করে নামানো সম্ভব নয়। সেকথা বলতে বসন্তদা বলল, তুই তো নেমে গেছিস। বুঝতে পারছি আমি নেমে এসেছি, বসন্তদা পারছে না, এরকম মনে হতেই পারে। আমি অনেক করে বোঝালাম। দাওয়ার সঙ্গেও কথা বললাম যে আমরা যেভাবে নেমে এসেছি, সেভাবে নেমে এস।

www.amaderchhuti.com

তারপর প্রায় এক দেড়ঘন্টা কেটে গেছে। আমরা অপেক্ষা করে আছি। তখনও কেউ ফিরছে না দেখে বার বার ওয়াকিটকিতে যোগাযোগ করার চেষ্টাও করছি কিন্তু কেউ ফোন ধরছে না। আমি আর পেম্বা দুজনেই তখন মোটামুটি নিশ্চিত যে নিশ্চয় বসন্তদাকে পিঠে করে আনতে গিয়ে দাওয়ার পা স্লিপ করেছে, দুজনেই পড়ে গেছে। আমার মন পুরোপুরি ভেঙ্গে গেছে - একসঙ্গে এলাম, বসন্তদাকে নিয়ে ফিরে যেতে পারব না! চোখে জল চলে এসেছে। তখন পর্যন্ত অন্য অভিযাত্রীরাও কেউ ফেরেনি, সেটাও খুব খারাপ লাগছে। বসে থাকতে থাকতে খানিক ঝিমুনির মত হয়েছিল, বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ পেম্বা ডেকে বলল, দেবাশিসদা, বসন্তদা আ গয়া। তাকিয়ে দেখি দাওয়া ঠেলে বসন্তদাকে টেন্টে ঢোকাচ্ছে। তখন আমি দাওয়াকে এই মারিতো সেই মারি - তুমি ওয়াকিটকি ধরছনা। দাওয়া বলল বসন্তদাকে প্রায় পিঠে করে এনেছে তাই ফোন ধরার অবস্থাই ছিল না।

বসন্তদা এরপর সেরিব্রাল ইডিমার মত একটা অবস্থায় চলে গেল - ভুল বকছে, ঠিকমত চিনতে পারছে না, রাগ করছে, যা খুশি বলে যাচ্ছে। পরদিন শেরপাদের বললাম, তোমরা যেভাবে হোক বেঁধে বসন্তদাকে নামাও, আমি নীচে চলে যাচ্ছি। আমি থাকলে বসন্তদা কথা শুনবে না। মিনিট পনেরোয় আমি দুশো মিটার নীচে তাঁবুতে নেমে গেলাম। বসন্তদাকে ওই দুশো মিটার নামাতে প্রায় দেড়-দুঘন্টা লাগল। ধাক্কা খেতে খেতে নামায় খুব আহতও হল, হাঁটুর মাংস ছিঁড়ে গেল। আমার মনে হল যে এভাবে নামাতে গেলেতো পথেই মারা যাবে। শেরপাদের বললাম যে যত ম্যাট্রেস আছে, সব দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধ। যখন প্রায় বাঁধা শেষ তখন দেখি একটা হেলিকপ্টার আসছে। নীচে একটা হুক ঝুলছে। ওরা এসেছিল ওই স্প্যানিশ লোকটির খোঁজে। কিন্তু হুক ঝুলছে দেখে আমরা বসন্তদাকে আটকে দিলাম। ওরা প্রথমে বেসক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বসন্তদার হিল ডায়ারিয়া হয়ে গিয়েছিল। তাই আর রিস্ক না নিয়ে বসন্তদাকে কাঠমান্ডুতে নামিয়ে নিয়ে আসে। ফলে বসন্তদা বেঁচে গেল।

অন্নপূর্ণা শিখর অভিমুখে

◆ বসন্তদা, এরকম একটা অভিজ্ঞতার পর কি এভারেস্ট বা কাঞ্চনজঙ্ঘার থেকেও ধৌলাগিরিকে কঠিন বলে মনে হয়েছে, নাকি সেইসময়ে ওই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল?

□ বসন্ত - ধৌলাগিরি হোক বা এভারেস্ট হোক, এমনকী ছোটখাটো কোন শৃঙ্গই হোকনা কেন সবগুলোই কিন্তু যেকোন ক্লাইম্বারের ক্ষেত্রেই কঠিন। যদি আমি এগুলোকে পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক আলোচনা করি তবেই এই প্রশ্নটা আসে। সেভাবে দেখলে ধৌলাগিরি কিন্তু এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা বা অন্নপূর্ণার মত কঠিন নয়। ওগুলো যেভাবে ক্লাইম্ব করতে হয়, এটায় সেই টেকনিকাল ক্লাইম্ব কোথাও নেই। যেটুকু আছে সেটা যেকোন শৃঙ্গ করতে গেলেই হয়। এখানে একটাই অসুবিধা ওপরে প্রচণ্ড হাওয়া। তার জন্য ধৌলাগিরি বেসক্যাম্পে আমাদের অনেকদিন বসে থাকতে হয়েছে। দুনম্বর ক্যাম্প থেকে ফিরে এসে ফাইনাল ক্লাইম্বিং-এর আগে বারবার ডেট চেঞ্জ করতে হয়েছে। যেদিন বেরোব বলে ঠিকঠাক, জানি ওয়েদার ভালো থাকবে, হাওয়া কম থাকবে, হঠাৎ জানতে পারলাম ওয়েদার চেঞ্জ হয়ে গেছে, ওপরে হাওয়া বেড়ে গেছে, আমাদের আবার অপেক্ষা করতে হল। এরকম অনেকবার হয়েছে। শেষপর্যন্ত ২১ তারিখ যখন লাস্ট ক্যাম্পে পৌঁছালাম, তখনও কিন্তু হাওয়া বইছে, আমরা বেরোতে পারলাম না। আর আরেকটা ব্যাপারও হয়েছিল - এর আগে এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা এই সবগুলোতেই লাস্ট ক্যাম্প থেকে ক্লাইম্ব করতে আমাদের মোটামুটি বারো ঘন্টা লেগেছে, কাঞ্চনজঙ্ঘায় একটু বেশি। কিন্তু এখানে লাস্ট ক্যাম্প থেকে এতটাই দূরত্ব যে ষোলো -সতের ঘন্টা লাগার কথা। কিন্তু আমরা অতটা সময় দিয়েও পৌঁছাতে পারিনি। এটা একটা বড় সমস্যা হয়েছিল। আমরা যদি আরও ওপরে একটা ক্যাম্প করতে পারতাম তাহলে হয়ত সুবিধা হত।

◆ ফিরে এসে 'তেনজিং নোরগে অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার' পেলেন। সেই অনুভূতিটা ঠিক কেমন? মনে হয়নি কি আরও আগেই এটা আপনার প্রাপ্য ছিল? পশ্চিমবঙ্গ থেকে আপনিই কি প্রথম এই পুরস্কার পেলেন?

□ বসন্ত - অবশ্যই খুব ভালো লেগেছে। এটাতো একটা স্বীকৃতি। উননব্বই সালে আমি যখন শুরু করেছিলাম, তখনতো ভাবিনি ক্লাইম্ব করে পুরস্কার পেতে পারি। এসব পুরস্কারের কথা জানতামও না, ভালোবাসা থেকেই করেছি। তারপর যখন লোকজনের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেতে শুরু করলাম যে ভালো একটা ক্লাইম্ব করলাম, তখন খুব ভালো লেগেছে। ২০০৯ সাল পর্যন্ত যারা পাহাড়ে যায় তাদের কাছ থেকেই শুধু এই স্বীকৃতিটা পেয়েছি। ২০১০ সালে মাউন্ট এভারেস্ট অভিযানের পর থেকে সাধারণ মানুষ এবং সরকারের কাছ থেকে আমরা সেই সম্মানটা পেলাম। মাউন্টেনিয়ারিং-ও যে একটা ভালো স্পোর্টস সেটাও সকলে উপলব্ধি করল। এভারেস্ট করার পরেই কিন্তু মনে হয়নি, কারণ ভারত থেকে অনেকেই এভারেস্ট ক্লাইম্ব করছে। এরপর আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্লাইম্ব করলাম - সেটাও স্বপ্নেও ভাবিনি। তারপরে অন্নপূর্ণা। কারণ কে২ বা নাঙ্গা পর্বত আমরা যেতে পারব না, অনুমতি মিলবে না। এই তিনটে যখন ক্লাইম্ব করলাম তখন আমার মনে হল যে এই যে ধারাবাহিকতা, এত ক্লাইম্ব করেছি, কোন বছর বাদ যায়নি, এই পুরস্কারটা আমি এবার পেতে পারি। কারণ ইন্ডিয়ান কোন সিভিলিয়ান পরপর এই রেঞ্জের তিনটে পর্বতশৃঙ্গ আরোহণ করেছে বলে আমার জানা নেই। তাছাড়া আমার আগে এমন অনেকেই পেয়েছেন যাঁদের কিন্তু এত ক্লাইম্বের অভিজ্ঞতাই নেই। এভারেস্টের আগে একুশটা অভিযানে অংশ নিয়েছি, যারমধ্যে উনিশটায় নেতৃত্ব দিয়েছি, আঠেরটা শৃঙ্গ জয় করেছি। আমিই বা পাব না কেন?

বসন্ত সিংহ রায়ের হাতে তেনজিং নোরগে অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়

শুধু পর্বতারোহণই নয়, আমি গাড়োয়াল হিমালয়ে ২০১০ সালে একটা উদ্ধারকাজে সরকারি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। অনেক ট্যুরিস্ট আটকে গিয়েছিল, মাউন্টেনিয়ারকে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর সিকিমে এরকম একটা রেসকিউ মিশনে গিয়েছিলাম। সেবার দেবাশিসও আমার সঙ্গে ছিল। পশ্চিমবঙ্গের যুবকল্যাণ দপ্তরের মাউন্টেনিয়ারিং বিভাগের অ্যাডভাইসার ছিলাম দু'বছর। এই ব্যাপারগুলোও কাজ করেছে।

না, আমি প্রথম নই। তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড অনেকগুলো আছে। একটা ল্যাণ্ডে দেয় - মাউন্টেনিয়ারিং-এ, আরেকটা আছে ওয়াটার অ্যাডভেঞ্চার যারা করে, আর এয়ার অ্যাডভেঞ্চারে। এর আগে এই পুরস্কারের নাম ছিল 'ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড'। ১৯৯৮ সালে মাউন্টেনিয়ারিং-এ পশ্চিমবঙ্গ থেকে পেয়েছিলেন অমূল্য সেন। আমি দ্বিতীয়। এছাড়া এখান থেকে বুলা চৌধুরি ও তাপস চৌধুরি অন্য ক্যাটেগরিতে এই পুরস্কারটি পেয়েছেন। এটা কিন্তু 'অর্জুন পুরস্কার'-এর সমতুল্য।

কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখর ছুঁয়ে বসন্ত সিংহ রায় ও দেবাশীষ বিশ্বাস

◆ বসন্তদার এই পুরস্কার পাওয়াটা বাঙালি অভিযাত্রীদের কাছে একটা গর্বের বিষয়। দেবাশিসদা আপনার কী মনে হয়েছিল খবরটা পেয়ে? ভবিষ্যতে আপনার প্রাপ্তির ঝুলিতেও এই পুরস্কার আসবে আমরা আশা করছি।

□ দেবাশিস - বসন্তদাতো ফিরে আসার মানসিকভাবে খুব ভেঙ্গে পড়েছিল, খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। বসন্তদা যেরকম, ঠিক সেরকম লাগছিল না। আসলে ফ্রস্ট বাইট হয়ে গেছিল। পায়ের তিনটে আঙুল কাটা গেছে। বাকী আঙুলগুলো চাঁচতে হয়েছে। হাঁটুর কাছে অনেকটা মাংস উঠে গেছে, বুকে ঠান্ডা লেগে আলসার মত হয়ে গেছে। মানসিক ওই পরিবর্তনটা খুব স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগছিল। এই পুরস্কারটা যেন বসন্তদাকে সেই আগের জায়গায় নিয়ে গেল। আমার কাছে সেটাই সব থেকে বড় পাওনা। আগামীতে আমরা আবার একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ব সেই আশাটা এখন আবার করতে পারছি।

পুরস্কার পেলে নিশ্চয় ভালো লাগবে। কিন্তু সেটার আশায় আমি বসে কখনই বসে থাকবনা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই এমন অনেক পর্বতারোহী আছে যাদের যোগ্যতা অন্যান্য রাজ্যে যারা পুরস্কার পেয়েছে তাদের থেকে অনেক বেশী। কিন্তু তারা পুরস্কার পায়নি। তাই আমিও আশা করিনা। আমার সবচেয়ে যেটা খারাপ লেগেছে যে বসন্তদার পুরস্কারটা নিয়ে আমাদের মিডিয়ার কোন হেলদোল নেই। কাগজে ছবি বেরোল বিরাট কোহলি অর্জুন পুরস্কার নিচ্ছে। অথচ তেনজিং নোরগে পুরস্কারও অর্জুন পুরস্কারের সমমানের। বসন্তদাকেই যখন করেনি, আমি যদি ভবিষ্যতে পাই তাহলে ব্যাপারটা একই হবে। তবে সাধারণ মানুষ খুশি হয়েছেন, আমার এইটাই ভালো লেগেছে। নিজের ক্ষেত্রেও সেই কথাটাই মনে হয়।

◆ বসন্তদা, সেদিন সম্বর্দ্ধনা সভায় সৌরেন ব্যানার্জি আপনার মাউন্টেনিয়ারিং জীবনের প্রথম দিককার কথা বলছিলেন। আপনার এই ভালোবাসার শুরু কীভাবে হল, প্রথমদিককার সেইসব অভিজ্ঞতার কথা একটু শুনব।

□ বসন্ত - সৌরেন ব্যানার্জির কাছ থেকেই আমি শিখেছি। পুরো ব্যাপারটাই হঠাৎ করেই, আগের থেকে জেনে, পরিকল্পনা করে কিছুই করিনি। অনেকদিন পর্যন্ত মাউন্টেনিয়ারিং বলে যে কোন অ্যাডভেঞ্চার হয়, সেটাই জানতাম না, ট্রেকিং-ও জানতাম না। আমার বাড়ি কৃষ্ণনগর। ছোটবেলায় আধা মফঃস্বল গ্রাম্য পরিবেশে প্রকৃতির মধ্যেই বড় হয়েছি। পুকুর ছিল, নদী ছিল, বদমাইশি ছিল, খেলাধুলোও ছিল। একটু বড় হয়ে বুঝলাম যে এবার চাকরি পেতে হবে তখন চাকরির জন্য চেষ্টা করলাম। তারপর চাকরিও পেয়ে গেলাম। প্রথমে সেন্ট্রাল গভর্মেন্টে, তারপরে ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কে স্টেনোগ্রাফার হিসেবে চাকরি পাবার পর মনে হল এদিকে এর বেশি কিছু আমি করতে পারব না, ব্যস, এটাই যথেষ্ট। বেড়াতে খুব ভালোবাসতাম। তখন বেড়াতে শুরু করলাম। হয়তো অফিসের লোকজনের সঙ্গে গেছি বা বন্ধুদের নিয়ে গেছি। সেইসময় ভালো ক্যামেরা পাওয়া একটা অসুবিধা ছিল - এখানে পাওয়া যেত না, দামও ছিল। যাইহোক, একটা ক্যামেরা কিনলাম - পেনট্যাক্স টু থাউজেন্ড। তখন কৃষ্ণনগরে সবে 'ম্যাক' হয়েছে। যার সঙ্গে গিয়ে ক্যামেরা কিনলাম সেই আমাকে বলল যে তুমি ওদের সঙ্গে যোগ দাও, বিভিন্ন অভিযানে যেতে পারবে, ছবি তোলার অনেক সুযোগও পাবে। ভাবলাম ভালোইতো, কৃষ্ণনগরের একটা ক্লাব, একটা কোর্স করব, অর্গানাইজারদের দু-এক জনকে চিনিও। আমি আসব শুনে তারা খুব খুশিও হল। সেটা ছিল ওদের দ্বিতীয় কোর্স - শুশুনিয়াতে পাঁচ দিনের রক ক্লাইম্বিং। তখন আমার বয়স সাতাশ বছর। সেই বয়সে পাঁচ দিন একটা ডিসিপ্লিন্ড লাইফ, তাঁবুতে থাকা, তার ওপরে পাহাড়ে চড়া - সবমিলিয়ে দারুণ রোমাঞ্চকর একটা অভিজ্ঞতা। ভালোবেসে ফেললাম রক ক্লাইম্বিং। অর্গানাইজেশনের সাথেও যুক্ত হয়ে গেলাম। ওরাও বুঝতে পারল যে এ একজন ভালো ক্লাইম্বার হতে পারে। সৌরেনদাও দেখল। তারপর নিয়মিত ট্রেকিং, রক ক্লাইম্বিং শুরু হল। ট্রেনিং-ও নিলাম উত্তরকাশী থেকে। বেসিক আর অ্যাডভান্স দুটো কোর্সেই খুব ভালো গ্রেড পেলাম। সেখানে থেরু নামের একটা পিক ক্লাইম্ব করলাম। সেটা নব্বই সাল। ওই বছরই সৌরেন ব্যানার্জির নেতৃত্বে আমরা প্রথম অভিযানে গেলাম। গ্যাংস্ট্যাং পিক। আমি একাই ক্লাইম্ব করলাম। একানব্বই থেকে আমিই দলের লিডার হলাম। প্রথমে যেগুলো টেকনিকালি একটু কম কঠিন সেই শৃঙ্গগুলো যেতাম। ছিয়ানব্বই-এ কামেট গেলাম। ভারতের তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। সেবারে হয়নি। পরেরবছর আবার গেলাম। সেবারে দেবাশিসকেও সঙ্গে পেলাম। আমি আর দেবাশিস ক্লাইম্ব করলাম। তারপরে আর পিছনে তাকাতে হয়নি। যে পিকটাই কঠিন মনে হয়েছে, অন্য ক্লাবগুলো ক্লাইম্ব করতে পারছে না, আমরা গেছি, ক্লাইম্ব করেছি।

◆ দেবাশিসদা, বসন্তদার সঙ্গে আপনার কবে প্রথম আলাপ হয়?

□□ দেবাশিস - ১৯৯৪ সালে যখন ম্যাক-এ প্রথম মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স করতে আসি তখনই বসন্তদার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বসন্তদা ট্রেনার আর আমি ট্রেনি। এরপর অনেক অভিযানেই বসন্তদা আর আমি সামিট টিম হিসেবে ছিলাম। এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, অন্নপূর্ণাতো আছেই, তার বহু আগে থেকেই আমরা একসঙ্গে অভিযানে যাচ্ছি। আমরা প্রথম একসঙ্গে যাই ভারতের তৃতীয় উচ্চতম পিক কামেট-এ। এরচেয়ে যে দুটো উঁচু - কাঞ্চনজঙ্ঘা আর নন্দাদেবী, সেগুলোয় কিন্তু ভারতের দিক থেকে সামিটের অনুমতি দেওয়া হয়না। সেদিক থেকে এটাই সর্বোচ্চ পিক যেটা ভারত থেকে ওঠা যায়। সেই

www.amaderchhuti.com

সামিটের পর থেকে আমরা একটা জুটিই হয়ে গেলাম।

◆ বসন্তদা, মাউন্ট শিবা, ইন্দ্রাসন আর থলয়সাগর - ভারতীয় পর্বতারোহী হিসেবে তিনটি পিকই আপনি প্রথম ক্লাইম্ব করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির কথা আমরা শুনব।

□ বসন্ত - প্রথম করেছিলাম মাউন্ট শিবা - ২০০২-এ। তার আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আটটা অভিযান হয়েছে, কিন্তু কেউ পারেনি। একেকটা টিম দুবার-তিনবার করেও গেছে। পিকটা খুব বেশি উঁচু কিন্তু নয়। তার আগে জুনকো তাওয়াই ক্লাইম্ব করেছিল ১৯৮৮ সালে - প্রথম যে মহিলা এভারেস্ট ক্লাইম্ব করেছিলেন। তারপরে আমি আর দেবাশিস ক্লাইম্ব করলাম। এর পরে আবার অনেকেই করেছে। গিয়ে দেখলাম তেমন কিছু কঠিন নয়, শুধু সাহস করে ঠিক রাস্তাটা খুঁজে বার করতে হবে। এরপরে ইন্দ্রাসন বলে একটা পিক, সেটাও ভারতে আমরাই প্রথম করি। ২০০৩-এ গিয়েছিলাম। সেবারে ৬০০ মিটার নীচ থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। তারপরে ২০০৪-এ আমি একাই ক্লাইম্ব করি। আরেকটা হল থলয়সাগর। নিরানব্বই সালে খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম। ওর ঠিক পাশেই ভৃগুবন বলে আরেকটা পিক ক্লাইম্ব করছিলাম। তখন ওটা নিয়ে আমাদের এত ভীতি ছিল যে ক্লাইম্ব করার কথা ভাবিইনি। সে বছর একটি বিদেশী দল ওটা ক্লাইম্ব করেছিল। ২০০৫ সালে যখন শিবলিঙ্গ ক্লাইম্ব করলাম, তখন একটা সম্বর্ধনা সভায় আমার সিনিয়র একজন বললেন, বসন্ত থলয় সাগর কর। সেই মাথার মধ্যে ঢুকে গেল। ২০০৬-৭-এ হয়নি। ইতিমধ্যে মাওয়ালি বলে একটা পিক ক্লাইম্ব করলাম। সেবারে দেবাশিস নেতৃত্বে ছিল। তারপরে বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে রুবলকাং বলে একটা পিক করলাম। ২০০৮-এ থলয়সাগর। আমার নিজের কাছে বেস্ট স্যাটিসফ্যাকটারি ক্লাইম্ব সেটাই। এই পিকটায় প্রচুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমাদের আগে পঁচাত্তরবার অভিযান হয়েছে। যারমধ্যে মাত্র পনেরবার ক্লাইম্ব হয়েছে। বিদেশিদের কাছে দারুণ আকর্ষণীয় একটা পিক। এমনকী ভারতের কঠিন পিকগুলোয় আর্মি, আই টি ভি পি, বি এস এফ থেকে ক্লাইম্ব করে, তারাও সাহস করেনি এটা করতে। এন আই এম টি করেনি, এইচ এম আই করেনি। আমি ২০০৮-এ করলাম। এটা নিয়ে একটা মজার কথা বলি, নিম্পট ওই শেরপাদের নিয়েই ২০১০-এ ক্লাইম্ব করে বলল যে ওরাই প্রথম ক্লাইম্ব করেছে (হাসি)। এদিকে ওদের পত্রিকাতেই কিন্তু আমার থলয় সাগর নিয়ে লেখা বেরিয়েছে। এখন কেউ যদি দাবি করে যে তারাই এভারেস্ট প্রথম ক্লাইম্ব করেছে তাতেতো কিছু করার নেই, কেউতো আর আইন-আদালত করতে যাবেনা। তবে আই ভি পি-র কাছে কিছু বলেনি, সেখানেতো রেকর্ডই রয়েছে।

থলয়সাগর শৃঙ্গ অভিযানে

◆ দীর্ঘ চব্বিশ-পঁচিশ বছর ধরে একের পর এক পাহাড়চূড়ায় উঠেছেন। বিশেষ কোন মুহূর্তের কথা কি এখন মনে পড়ছে?

এভারেস্ট চূড়ায়

□ বসন্ত - বিশেষ মুহূর্ত বলতে এভারেস্টের মাথায় যখন উঠেছি। সেটা যেন একটা চরম প্রাপ্তি। আমি আজকে তেনজিং নোরগে পুরস্কার পেয়েছি, সেটা খুব ভালো লেগেছে, প্রচণ্ডই খুশি হয়েছি। কিন্তু এভারেস্টের মাথায় উঠে যে স্যাটিসফেকশন হয়েছে, তার সঙ্গে আর কিছুরই তুলনা হয় না, সেটা একেবারেই আলাদা। এত চেয়েছি যে এভারেস্ট ক্লাইম্ব করব, এদিকে বয়সও বাড়ছিল। আমি ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সে এভারেস্ট ক্লাইম্ব করেছি। ক'দিন আগে আমার স্ত্রী বললেন, আমরা যখন ২০০১ সালে বেনারস গিয়েছিলাম, তখন আমি গঙ্গায় প্রদীপ ভাসিয়েছিলাম তুমি যাতে এভারেস্ট ক্লাইম্ব করতে পার এই প্রার্থনা করে। আমি হয়ত মুখে কিছু বলিনি, কিন্তু সেও বুঝতে পেরেছিল যে আমি এত চাইছি । নিরানব্বই সালে একটা টিম তৈরি হয়েছিল এভারেস্ট অভিযানের। সেখানে সিলেকশনের জন্য আমায় রেখেছিল বলে খুব খুশি হয়েছিলাম। শেষপর্যন্ত ওরা দুজন সদস্যের একটা টিম নিয়ে ২০০১ সালে বেরোয়। সেই দুজনের থেকে আমি বেশি যোগ্য ছিলাম, কিন্তু আমাকে ওরা নেয়নি। সেবারে প্রচণ্ড দুঃখ পেয়েছিলাম, সেটা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ওরা খুব বেশিদূর উঠতেও পারেনি, সেটা অবশ্য অনেক পরে জেনেছিলাম। ২০১০-এ এভারেস্ট ক্লাইম্ব করে ফিরে আসার পর ওদের দলটির যে লিডার ছিল সে এসে আমায় কনগ্রাচুলেশন জানিয়ে বলেছিল, বসন্ত আমি আজকে স্বীকার করছি সেদিন ভুল করেছিলাম।

◆ বসন্তদা, দেবাশিসদা আপনারা দুজনে একসঙ্গে অনেকদিন ধরে অভিযানে যাচ্ছেন, একটার পর একটা সামিট করছেন। একটা দারুণ জুটিই বলা যায়। দুজনে মিলে একসাথে জীবনের পথে চলাই হোক আর পাহাড়ের পথে, বোঝাপড়াটাই একটা বড় ব্যাপার। অনেক সময়তো মতের অমিলও হয়। নিজেদের মধ্যে এই বোঝাপড়াটা কেমন ভাবে ধরে রেখেছেন?

□ বসন্ত - দেবাশিস আর আমিতো অনেকদিন একসঙ্গে অভিযান করছি। সেদিক দিয়ে দলের অন্যান্যদের চেয়ে ওর ক্ষমতা অনেকটাই বেশি। খুব ভালো ক্লাইম্বার, অল্টিচুডে খুব ভালো ফিট। ওর অন্য নানান গুণ আছে - ভালো ছবি তোলে, গান গায়। আর সব মিলিয়ে খুব ভালো ছেলে। ওর যেটা অসুবিধা যে দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকার জন্য অনেকসময় ছুটি পায় না বলে যেতে পারেনা, বা নেতৃত্ব দেওয়ার ততটা সুযোগ পায়নি।

একসঙ্গে যখন গেছি কখনও মনোমালিন্যতো হয়েইছে, সেতো স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকলেও ঝামেলা হয়। আমি হয়তো বকেছি, কিন্তু ও কখনও মুখের ওপর কোন কথা বলেনি। আমি একটু বকাবকি করি। আজকে ম্যাক এই জায়গায় দাঁড়িয়েছে, সেটা অনেকটাই আমার এই কড়া মনোভাবের জন্যই।

□ দেবাশিস - আমি আসলে খুব ঠান্ডা মাথার মানুষ। সমস্ত দিকেই খুব কম্প্রোমাইজ করতে পারি। তুমি বললে না জীবনের ক্ষেত্রে - আমার বউয়ের সঙ্গেও বোধহয় গত বারো-তেরো বছরে কোন ঝগড়া হয়নি। মন কষাকষি হলে অন্যজনের নিশ্চয় খারাপতো লাগেই, কিন্তু আমার নিজেরওতো মানসিক অশান্তি হয়। কেন শুধু শুধু নিজের মানসিক শান্তি নষ্ট করব? আমার সঙ্গে সকলের খুব ভালো সম্পর্ক। স্বাভাবিকভাবেই আমার সঙ্গে বসন্তদার এমন কিছু কখনও হয়নি যাতে এই সুন্দর সম্পর্কটায় ছেদ পড়তে পারে। আসলে বসন্তদা কেন, যেই হোতনা কেন আমার সঙ্গে কোন অসুবিধা হোত না। আমি সবার সঙ্গে খুব মিলে চলতে পারি। আমার কোনদিনই কারোর সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক হয়নি, তাই বসন্তদার সঙ্গেও হবেনা এটাইতো স্বাভাবিক। তাছাড়া বসন্তদাও মানুষ হিসেবে খুব খারাপ না আর আমি মানুষ হিসেবে খুব ভালো (হাসি)।

◆ বসন্তদা, পর্বতারোহীদের মধ্যে অনেক সময় নাম, খ্যাতি, আগে ওঠার চেষ্টা এসব নিয়ে রেষারেষি হয়। তেমন কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে কখনও?

□ বসন্ত - একটা স্বাভাবিক কম্পিটিশনতো যেকোন ক্ষেত্রেই থাকে। আমার আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অতনু চ্যাটার্জি বলে একজন চারবার এভারেস্ট অভিযানে গেছে। ভদ্রলোক মোটামুটি আমারই বয়সী। ২০০৩ সালে এইচ এম আই-এর সঙ্গে চতুর্থবার অভিযানে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে একটা অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছিল। তখন জানতে পারি যে আবার এভারেস্ট অভিযানে যাচ্ছে। শুনে ভীষণ একটা কষ্ট পেয়েছিলাম। কিন্তু ঈর্ষা হয়নি। এভারেস্ট অভিযানের আগে তার বাড়িতে গিয়ে আমি অভিযানের খুঁটিনাটি বিষয়ে পরামর্শ নিয়েছি। এই শ্রদ্ধাটা কিন্তু সবসময় কাজ করেছে যে ও একজন ভালো ক্লাইম্বার।

তবে মানুষের কাছে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা পেতে গেলে শুধু ভালো ক্লাইম্বার হলেই হয়না, ভালো মানুষ হতে হবে। আমি নিজে এটা মেনে চলি। কিন্তু আমার

সমসাময়িক বা সিনিয়র অনেকেই আমাকে লেগপুল করেছে, বিভিন্নসময় বদনাম করেছে। আমি শুনে খুব কষ্ট পেয়েছি। আমি পিক ক্লাইম্ব করে এসেছি, মন্তব্য করল, ওর ছবি ভালো হয়নি। ছবিতো সবসময় ভালো হয়না। আমিতো সবাইকে ছবি দেখাতে যাচ্ছিনা। আমার যে অথরিটি ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন আমি সেখানে জমা দিই। তারা আমাকে স্বীকৃতি দেয় যে ক্লাইম্ব হয়েছে। সেখান থেকে কখনও জিজ্ঞাসাবাচক একটা চিঠিও পাইনি। অথচ এখানে অনেকেই খুব বিশ্রীভাবে সমালোচনা করেছে - ও তো গেলেই ক্লাইম্ব হয়ে যায়। থলয় সাগর গিয়েছি, তখন আবার মন্তব্য করেছে, গিয়েছেতো ভালো, কতজন ফিরবে! কারোর এমন সাহস হয় নি যে ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশনকে একটা চিঠি দিয়ে বলে যে ওর এই ক্লাইম্বটা হয় নি, অথচ পিছনে প্রচুর বলে যাচ্ছে। তবে এদের সংখ্যাটা অবশ্যই অনেক কম। আমার প্রচুর শুভানুধ্যায়ী, তারা আমাকে ভালোবাসে, আমার কাজটাকে সম্মান আর স্বীকৃতি দেয়।

◆ সামিট করেছেন এমন কোন শৃঙ্গ দ্বিতীয়বার আরোহণের সুযোগ পেলে কোথায় যাবেন, এভারেস্ট?

□ বসন্ত - দ্বিতীয়বার কোন পিকেই যেতে আমার ঠিক ইচ্ছা করে না। জানা জিনিস তো। তবে যেমন এভারেস্টে সাউথ দিয়ে গিয়েছি, যদি নর্থ দিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাই অবশ্যই যাব। অর্থাৎ অন্য রুটে যাওয়ার সুযোগ পেলে নিশ্চয় যাব।

◆ পর্বতারোহণের বাইরে অন্য কোথাও বেড়াতে গেছেন? সেসব অভিজ্ঞতা কেমন লেগেছে?

□ বসন্ত - পর্বতারোহণের বাইরেও আমি প্রচুর বেড়িয়েছি। অজন্তা-ইলোরা-পুণে হয়ে বম্বে, এছাড়াও বম্বেতে আরও বেশ কয়েকবার গেছি। বেনারস, সারনাথ। আরাকু ভ্যালি, পুরী, উত্তরবঙ্গ, কাজিরাঙ্গা, শিলং, আসাম। এগুলো বেশিরভাগই গেছি ছোটবেলার বন্ধুদের সঙ্গে পারিবারিকভাবে। সবাই মিলে খুব আনন্দ করেছি।

◆ ২০১০ সালে আপনার ও দেবাশিসদার এভারেস্ট জয়ের পর থেকে দুই বাংলার পর্বতারোহীরাই এভারেস্ট এবং অন্যান্য ৮০০০ মিটারের ওপরের শৃঙ্গগুলি একের পর এক জয় করছে। বাঙালি অভিযাত্রীর এই বদলে যাওয়াটা কি আপনাদের জন্যই সম্ভব হল? কি মনে হয়?

□ বসন্ত - আসলে আমরা যাওয়ার পর একটা ধারণা হয়েছে যে টাকাটা যোগাড় করা যেতে পারে। তারপরে আমরা যেমন বলে দিয়েছি কীভাবে কী করতে হবে। কিছুই না জানার জন্য অ্যারেঞ্জমেন্টের অনেককিছুই আমাদের খুব কঠিন বলে মনে হয়েছিল, আসলে কিন্তু তা নয়। এখন যারা যাচ্ছে তারা জানে আমাকে ঐসব নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না। শুধু টাকাটা যোগাড় করতে হবে, আর ক্লাইম্ব করতে হবে। আমরা তখন কে পারমিশন দেবে, এত টাকার ব্যাপার বিশ্বাস করে কোন এজেন্সির মাধ্যমে যাব, কোথায় ইকুইপমেন্ট, অক্সিজেন এসব পাওয়া যাবে এসব কিছু জানতামনা বলেই ভয় পেতাম। আমার শেরপা পেম্বা লোবেন এজেন্সির কথা বলেছিল। অনেক যাচাই করে তারপরে ওদের সঙ্গে চুক্তি করি। তারপর থেকে সবাইতো ওদের মাধ্যমেই যাচ্ছে। আমার পরেই দীপঙ্কররা গেছে। ওদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছি। তারপরে সেইসূত্রেই আবার অন্যান্যরাও যাচ্ছে। আসলে আমরা কিছু লুকাইনিতো। আমাদের আগে যেমন অনেকেই কিছু তথ্য ঠিক পরিষ্কার করে বলেনি। সেইজন্যেই আমাদের পরেই পরপর ক্লাইম্ব হচ্ছে।

◆ দীর্ঘদিন ধরে ওতপ্রোতভাবে পাহাড়ে চড়ার এই নেশার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা থেকে আগামীদিনের পর্বতারোহীদের জন্য আপনার পরামর্শ কী?

□ বসন্ত - দেখ, আমরাতো কোন প্রচারের জন্য আসিনি, ভালোবেসে এটা করেছি। রোজকার জীবনের বাইরে কিছুদিন অন্য পরিবেশে অন্যভাবে কাটানো। ট্রেকিং যে কেউ করতেই পারে। তবে আজকের যা ফাস্ট লাইফ তাতে আমাদের মতো অনেকদিন ধরে পর্বতারোহণ করা একটু শক্ত, অত সময় দিতে পারবে না। ছোটখাটো পর্বতারোহণ দিয়ে শুরু করতে পারে। ভারতেই অনেক ছোট ছোট পিক আছে, যেগুলো এখনও কেউ ক্লাইম্ব করেনি। সেগুলো করতে পারলেতো ভালো লাগবে। আমি নিজেও ছোট ছোট দিয়ে শুরু করে এই জায়গায় পৌঁছেছি। এর একটা অন্য স্যাটিসফেকশন আছে। আজ যে বিপদের মধ্যে পড়েও বেঁচে ফিরে আসলাম তার কারণ কিন্তু এতদিনের এই ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা। আর প্রথমেই যদি এভারেস্টে চলে যায় তাহলেতো জীবনে আর কোন স্বপ্নই থাকবে না। কিন্তু এখনতো প্রচারের যুগ। আমার, দেবাশিসের বা দীপঙ্করের মতো কয়েকজনের যে অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতা বা অধ্যবসায় কিন্তু তুমি এখন দেখতে পাবে না। দু-একটা ক্লাইম্ব করার পরই এভারেস্টে চলে যাচ্ছে। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে একটা সময় এসে হতাশা এসে যাবে। আসলে আমাদের সাফল্যের পর এই যে একটা প্রচারের আলোয় আমরা এসেছি সেটা অনেককে আকর্ষণ করছে। কিন্তু তার পিছনে যে একটা দীর্ঘ লড়াই রয়েছে সেটা চোখে পড়ছে না।

◆ এর পরে কোথায় যাওয়ার কথা ভাবছেন?

□ বসন্ত - নেক্সট প্ল্যান হচ্ছে ধৌলাগিরিতে অনেক টাকা ধার হয়েছে সেটা শোধ করা, তারপরে অন্যকিছু ভাবতে পারব।

www.amaderchhuti.com

সাক্ষাৎকার - দময়ন্তী দাশগুপ্ত

পৃথিবীর চূড়া ছুঁতে আর কয়েকটা পা - মাউন্ট এভারেস্টে

~ পর্বতারোহণের আরো ছবি - বসন্ত সিংহরায় || দেবাশিস বিশ্বাস ~

ঘনাদার শ্বশুরবাড়িযাত্রা - অথঃ কোচবিহারকথা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কোচবিহারের তথ্য

ট্রেন থেকেই শুরু করি। শিয়ালদা থেকে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস সন্ধ্যে ৭.৩৫ এ ছাড়বে। কোচবিহার যাব। কোচবিহারের সঙ্গে আমার দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সম্পর্ক। সৌজন্য - বিবাহ। মনটা খুব ভালো নেই। গচ্চা গেছে অনেক পয়সা। কী সব উপহার কিনেছেন আমার উনি। বললেন - আরে আমরা তো সিনিয়ার সিটিজেন। ভাড়া তো কম লাগছে যেতে। বুঝলাম, সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

যথারীতি শেয়ালদা পৌঁছলাম। জানি প্ল্যাটফর্ম ৯এ। শেষমুহূর্তে মাইকে বলল প্ল্যাটফর্ম ৮। যৌবনের সেই 'সার্ভিস উইথ এ স্মাইলের' কথা মনে পড়ল। "সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে"। 'রং বদলায় না'।

হুড়মুড় করে প্ল্যাটফর্ম ৮। কোচ নং ৯। প্ল্যাটফর্ম না হোক, কোচ তো হল। এবার দেখলাম, যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানেই কোচটা দাঁড়াল। কোচবিহারে বিহার করতে যাচ্ছি, কোচ তো সামনে দাঁড়াবেই। কি বলুন? তা, ধীরে ধীরে সিটে গিয়ে বসে, জম্পেশ করে একটা সিগারেট ধরালাম।

হাঁ হাঁ করে উঠলেন সামনের ভদ্রলোক - "খাবেন না, খাবেন না!"

"কেন?"

"দেখছেন না! এই যে, আমার প্যাকেট। আমি বলে খাচ্ছিনা, আর আপনি খাচ্ছেন?"

"তাতে,আপনার কি? আমি তো আপনার কাছে সিগারেট চাই নি।"

"বুঝবেন ঠ্যালা, যখন পুলিশ ধরবে!!!"

"কেন,পুলিশ ধরবে কেন, আমি কি চুরি করেছি নাকি,আপনার সিগারেট?"

"কোন বেকুবের পাল্লায় পড়লাম রে বাবা!!! কোত্থেকে আসচেন? দেখে তো হটেনটট মনে হচ্ছে না"

"দেখুন! গালাগালি করবেন না! বেকুবটা বুঝি, হটেনটট মানে কী?"

"যা ইচ্ছে বুঝুন, শুধু সিগারেটটা খাবেন না"

"আরে মশায়, আপনি কি আমার গার্জেন নাকি? তিনি তো সাথেই আছেন,কিছু তো বলছেন না!! আপনি কে মশাই?"

www.amaderchhuti.com

এবার হাসতে হাসতে পাশের কিউবিকল থেকে ভদ্রলোকের মেয়ে (পরে জেনেছি) এসে সামনে এসে বলল - "জেঠু, বহুদিন হলো রেলের প্ল্যাটফর্ম আর কামরায় সিগারেট খাওয়া বন্ধ। পুলিশ দেখতে পেলে হয় ফাইন না হয় জেলে পুরবে আপনাকে। জানেন না?

অনেকদিন ট্রেনে চড়েন নি, না?"

ধাঁ আ আ-- করে মনে পড়ল। চট করে সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলে, আমার পক্ষে যতটা সম্ভব মোলায়েম মুখে বললাম - "আগে বলবেন তো!!! খালি হেঁয়ালি করে যাচ্ছিলেন!!!"

ভদ্রলোক স্বভাবতই গম্ভীর।

বললাম - "আমার চেহারা দেখেছেন?" (যাঁরা আমায় "লাইভ" দেখেছেন,তাঁরা জানেন,আমি গোরিলাদের সাক্ষাৎ বংশধর)

"কেন? মারবেন নাকি?"

"ছিঃ! ছিঃ! কি যে বলেন!!! আরে না মশাই। আমার যেমন দেহে ফ্যাট, সেরকম ব্রেনেও ফ্যাট! তাই ব্রেনের হার্ড ডিস্কের "ফাইল অ্যালোকেশন টেবল" (FAT) কাজ করে না আমার। ফলে, এই ধূমপায়ীদের বিরূদ্ধে ফরমানটা ভুলে মেরে দিয়েছি।"

এবার মেয়ে হেসে বলল -"NTFS বা New Type File System, ব্রেনে লাগিয়ে নিন। অনেক তাড়াতাড়ি কাজ করবে।"

আমি বললাম - "বুঝলে হে, আমার সবই Unmovable Files। কিস্সু কাজ হবে না!"

কন্যার কথার তোড়ে এবারে পিতার আশ্চর্য হবার পালা - "কী ভাষায় কথা বলছেন আপনারা?"

আমি - "হটেনটটদের ভাষা!"

অবশেষে রাতের খাওয়া। রুটি একদম খেতে পারি না, সেই শুকনো রুটি! আর আলুর দম! উনি বললেন - খরচা বাঁচাচ্ছেন!!! (আলু ১০ টাকায় নেমে এসেছে) যাই হোক, খেয়ে, টয়লেটে গিয়ে সিগারেটে সুখটান দিয়ে;শুয়ে পড়লাম।

বোধহয় মালদা হবে। রাত নিঝুম। আমাকে কে যেন দূর থেকে ডাকছে - "ও মশাই,ও মশাই.....।" নিশির ডাক হতে পারে ভেবে ঘাপটি মেরে অনেকক্ষণ পড়ে থাকলাম। এবারে জোর ঠ্যালা খেয়ে হুড়মুড় করে উঠতে হলো। উনি দেখি মাথা নীচু করে বসে। ওই ভদ্রলোক, সঙ্গে আরও কিছু লোক - "মশাই, আপনার নাকের সাউণ্ড বক্সের 'বাস'টা কমাবেন?"

"হটেনটটদের ভাষা জানলেন কি করে?"

"রাখুন তো, কোচে কেউ ঘুমতে পারছে না"

"কেন?"

"অত জবাব দেবনা! আর ঘুমোবেন না। এবার আমরা ঘুমোই"

"এ তো তুঘলকি ফরমান"!

"পরিবর্তনের জমানা! বুঝেছেন??? এই এক প্যাকেট সিগারেট দিলাম, টয়লেটে মাঝে মাঝে গিয়ে খেয়ে আসবেন, কিন্তু খবরদার!!!!! ঘুমোবেন না!!!! আপনি হৃদয়হীন হতে পারেন, কিন্তু আমরা নই। তাই সিগারেট দিলাম!"

"নাকের আমি, নাকের তুমি, নাক দিয়ে যায় চেনা" - একজন ফুট কাটলেন।

আরও একজন - "ঘুম পেয়েছে? বাড়ি যান! ট্রেনে কেন স্যার!"

বাউনের ছেলে - সব সইতে পারি, এমনকি চর্মপাদুকার প্রহার পর্যন্ত, কিন্তু অপমান??? কদাপি নয়! রেগে গিয়ে টয়লেটের সামনে মোবাইল চার্জ করতে লাগলাম!

সক্কাল বেলায় নিউ জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে প্রায় অর্ধেক কোচ খালি! যাবার সময় ওই মেয়েটি বলে গেল – "বোফোর্স কামান দেখি নি। আওয়াজটা শুনে গেলাম।"

গোটা উত্তরবঙ্গে, দোলের দিন আবীর খেলা হয়। আর তার পরের দিন রং খেলা। কোচবিহারও তার ব্যতিক্রম নয়। ফলে যে দিন কোচবিহার পৌঁছলাম,সে দিন কোলকাতায় দোল খেলা হলেও, কোচবিহার নিরাপদ। কোচবিহার নামে ষ্টেশন থাকলেও, নিউ কোচবিহার ষ্টেশনে নামতে হয়। ওখানেই উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের যাত্রা শেষ। নিউ কোচবিহার ষ্টেশন থেকে কোচবিহার শহর প্রায় ৯ কি.মি.। রিক্সা, বাস আর প্রচুর পরিমাণ ভাড়া গাড়ি আপনাকে শহরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

আস্তে আস্তে মালপত্র নিয়ে, বড় শালাবাবুর (ষ্টেশনে এসেছিল রিসিভ করতে, নাম - রাহুল) সঙ্গে ওভারব্রিজ পার হয়ে, আমার ওনার সঙ্গে যখন বাইরে এলাম, তখন প্রায় সব গাড়ি অদৃশ্য। বসার উপযুক্ত করে নেওয়া,একটা টাটা "এস" গাড়িকে ডাকল রাহুল।

ড্রাইভার - "জামবাবু না? এই গাড়িতে আসচেন? বসেন, বসেন। দিদিও বসেন। রাহুলদা, আমারে বসায়ে ইষ্টিশনে গেল, আপনাদের আনতে। মজবুত গাড়ি। ভয় নাই।" বলে, সিটটায় বাড়ি দিতেই, একটা মেঘ উড়ে এল। ধুলো না নস্যি, বুঝলাম না! হাঁচতে, হাঁচতে প্রাণ অতিষ্ঠ।

ড্রাইভার - "তা অনেকদিন পরে আসতিছেন, জামবাবু। কোচবিহারের অবস্থা একটু পালটিসে। আপনিও মোটা হই গেল।" মেঘটা আস্তে আস্তে কাটছে! হাঁচিটাও কমছে!

ড্রাইভার এবার তুরীয় মেজাজে।

বলল - "জামবাবু, একটা নতুন টিভি কিনসি। কালারিং। বউ পোস্কার করতে যাতিছিল, আমি মানা করসি। করসে কি, কাপড়ে সোডার জল দিয়া ঘসতে যাতিছিল, ওই ইস্ক্রিনটা। মাথথা খারাপ! সোডা দিয়া ঘষলে যদি রং উইঠ্যা গিয়া সাদা কালো হইয়া যায়! সোডা দিয়া আজকাল খুব রং উঠতিসে। কি দিয়া পোস্কার করব, বলি ফ্যালান তো!"

গম্ভীর হয়ে বললাম, "ঝামেলা মিটে যাক, তোর বাড়ি গিয়ে সব বলে দেব।"

কোচবিহার শহরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সব রাস্তা সোজা। সুপারি গাছ প্রচুর। আর প্রায় প্রত্যেক বাড়ির সামনে বাগান। রাজার আমলে নিয়ম ছিল, প্রত্যেক বাড়ির সামনে ফুলের বাগান রাখা বাধ্যতা মূলক ।

জীবনযাত্রা এখানে বেশ ঢিলে। সেই ইঁদুর দৌড় নেই। লোকে আয়েস করে বাজার হাট করে। সকাল আটটার আগে সেরকম বাজার হাট বসে না।

স্থানীয় আপিস বাবুরা বাজার করে, জল খাবার খেয়ে দপ্তরে যান। তারপর দুপুরের টিফিন হলে আবার বাড়ি এসে ভাত খান।

আগে ভীষণ বৃষ্টি হতো বলে, সব বাড়ির ওপরে টিনের ছাদ। এখন অবশ্য বহুতল বাড়ি উঠছে । লোকজন বেশ দার্শনিক টাইপের। ধরা যাক, আপনি কোনো দোকানে গেলেন কিছু কিনতে। ভিড় না থাকলেও আপনাকে বেশ খানিকটা দাঁড়াতে হবে। দোকানদার হয়তো টিপিন করছেন, বা আপনাকে জরীপ করবে। আপনাকে নতুন মনে হলে কিছু খেজুর করবেই। এম.আর.পি. যা লেখা থাকবে সেটাই দিতে হবে বা একটু বেশি দিতে হবে। কারণ হয়তো সেটা এখন আউট অফ ষ্টক। এখন কিছুটা পাল্টেছে তবে এম.আর.পি.র নীচে পাবেন না।

আবার অন্য ঝামেলাও আছে। ধরুন আপনার ক্যামেরার এস.ডি. কার্ড ফুল। এবারে সেটাকে সিডিতে তুলে কার্ড খালি করতে চান। যান দোকানে , একটা ব্ল্যাঙ্ক ডিভিডির দাম ৫০ টাকা। আপনি বললেন :- "সেকি ! কলকাতায় ম্যাক্স টু ম্যাক্স দাম ১৫, এখানে ৫০ ?"

কান চুলকোতে চুলকোতে দোকনি বলবে :- "ওসব সস্তা মাল আমরা রাখি না। আর আনার পয়সাটা কে দেবে শুনি ?"

ও হ্যাঁ ! বলতে ভুলে গেছি। আমার নয় শ্বশুরবাড়ি, আপনাদের তো হোটেল খুঁজতে হবে। ইলোরা, যুবরাজ, রয়্যাল প্যালেস, কোচবিহার হোটেল ছাড়াও আরও অনেক হোটেল পাবেন।

এছাড়াও আছে বেনফিসের গেষ্ট হাউস। সরকারি ব্যাপার - এসি হয়তো কাজ করছে না । এক্ষুনি ঠিক করছি বলে, আসবে এক / দেড় ঘন্টা পর। খাবার পাবেন, তবে মুঠোফোন থেকে অর্ডার দিলে পাবেন অনেক পরে। তবে জায়গাটা নিরাপদ। অবশ্য কোচবিহার শহরটাই বেশ নিরাপদ ।

কোচবিহার শহর হলো জেলা সদর। বয়ে গেছে তিস্তা, তোরসা, রায়ডাক, জলঢাকা, সংকোশ, গদাধর, কালজানি নদী।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জায়গাগুলো হলো হলদিবাড়ি, হেমকুমারী, কুঠি, সিতাই, শীতলকুচি, মধুসূদন, জামালদহ, অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম, চ্যাংরাবান্ধা, মেখলিগঞ্জ, দিনহাটা, বলরামপুর।

চলুন একটা রিক্সা নিই । শহরটাকে ঘুরে দেখি ।

www.amaderchhuti.com

প্রথমেই যাই মদন মোহন মন্দির ।

চিরন্তন চারচালা শৈলীর মন্দির। সোনা আর অষ্টধাতুর তৈরি আসল মদন মোহন বিগ্রহ চুরি গেছে প্রায় ২০ বছর আগে। মন্দিরের সামনে বৈরাগী দীঘি। একসময়ে এই জায়গায় বৈরাগীদের বসতি ছিল। তাই এই নাম। মন্দিরের চাতালে উঠে কিন্তু ছবি তোলা নিষেধ। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ এর ভিত্তি স্থাপন করেন।

এই মন্দিরের সংস্কারের সময় যে শিলালিপিটা আবিস্কৃত হয়েছে, তার আয়তন ৭৭.৫ সেমি X ১৪ সেমি । লিপি বাংলা হলেও, ভাষা সংস্কৃত ।

" বিধু বিধু সংহিত গজ সম্মিত শাক মিথুনগত মিত্রে
নরপনরেন্দ্রাত্মজনি নৃপেন্দ্রাহ্বয় নৃপতিঃ শরনেত্রে।
দিন ইহ দৈবত গৃহ ভূ-স্থাপিত মকরোদাত্ম করেণ
বাস্তুকৃতোচিত রৌপ্য বিনির্ম্মিত শস্ত্র বিশেষ ধরেণ।।"

(ঋণ :- বালুরঘাট থেকে প্রকাশিত " মধুপর্ণী" পত্রিকার কোচবিহার সংখ্যা, ১৩৯৬ বাংলা সন)

অস্যার্থ :- ১১৮১, অঙ্কের বামাবর্ত অনুসারে (বাঁ দিক থেকে) ১৮১১ শকাব্দ +৭৮ = ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ। ২৫ (শরনেত্রে) শে আষাঢ় (মিথুন গত মিত্রে) নৃপতি নরেন্দ্র নারায়ণের পুত্র নৃপতি নৃপেন্দ্র নারায়ণ রৌপ্য নির্মিত শস্ত্রের সাহায্যে স্বহস্তে দেব গৃহের ভিত্তি স্থাপন করলেন ।

অবিশাস্য দ্রুতগতিতে কাজ শেষ হয়ে ১৮৯০ সালের ২১ শে মার্চ রাজমাতা নিশিমযী আই (অর্থ - মা) দেবতী এই মন্দির উদ্বোধন করেছিলেন ।

মন্দির দেখা হলো ? চলুন বেরিয়ে পড়ি এখান থেকে। রিক্সাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন ? ভালো করেছেন। ঘন্টা প্রতি ৭০/৮০ টাকা নেবে। আর তাহলে ঝামেলা নেই। না হলে যেখানে সেখানে রিক্সা পাওয়া খুব মুশকিল । অবশ্য শেষে তারা আরও ৮০ টাকা চাইতে পারে ভাড়ার ওপর, তবে ওটা ওদের নিজেদের জন্য নয়। মদন মোহনের ভোগে লাগাবে বলে নেয়। এরা খুব ভক্ত মানুষ, এটা মনে রাখবেন ।

হাসছেন বুঝি ? তা হাসুন। আমার সাদা মনে কাদা নেই।

সোজা চলুন সাগরদিঘির পাড়ে। বিশাল একটা দিঘি। সমুদ্রের মত দেখতে লাগে বলে সাগর দিঘি।

প্রথমেই বাঁ ধারে চোখে পড়বে, একটা প্যাটন ট্যাংক। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়, এটা দখল করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। সাগরদীঘির পাড় ঘিরে রয়েছে, কোচবিহার শহরের প্রায় সমস্ত প্রশাসনিক ভবনগুলো। ১৯৭৪ সালে এক মাষ্টার মশাইকে বিএসএফরা বিনা কারণে গুলি করে মারলে এই ভবনগুলো পুড়িয়ে দেয় ক্ষুব্ধ জনতা। আবার নতুন রূপ নিয়েছে এই সব। সন্ধে হয়ে গেলে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজে। পাড়ে পাড়ে বসার জায়গা আছে। বিবাহিতরা বসে দুদণ্ড নতুন করে প্রেমালাপ করে নিতে পারেন।

এই দীঘির চারধারে কোচবিহারের সমস্ত বিবরণ দেওয়া আছে, ছোট করে তা লিখেছেন - ডঃ নৃপেন্দ্র নাথ পাল।

খিদে পেলে খাবার পাবেন অনেক রকম। তবে, আমার মতে ভেজিটেবল মোমো খান। অন্য খাবার খেলে, অ্যাসিড যদি না হয় তা হলে টাকা ফেরৎ। (ওরাও দেবে না, আমার কথা বাদ দিন - গরীব আদমী ছে বাবু)

এই সাগরদীঘি নৃপেন্দ্রনারায়ণ তৈরি করেন বলে জানা যায়। যদিও এর কোনো তথ্য প্রমাণ দিতে পারবো না। মূলত খাবার জল এখান থেকে সরবরাহ করা হতো।

যেই করে থাকুন, কোচবিহারে এখনও দীঘির সংখ্যা প্রচুর। দুঃখের কথা, প্রোমোটাররা এইগুলো বুঁজিয়ে কিছু ফ্ল্যাট বাড়ি তুলছেন।

চলুন, " গ্যাঁজাবো" বলে একটা রেস্তোঁরাতে কিছু মুখে দেই । পেট ভরবে, স্বাদ মোটামুটি । খিদের মুখে মন্দ নয় ।

এবারে চলুন কোচবিহারের রাজপ্রাসাদ দেখি। সোয়াশো বছর আগে রোমের সেন্ট পিটার্স চার্চের আদলে গড়া এই রাজপ্রাসাদ তৈরি করেছিলেন রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ। এখানে হাতির মূর্তি-সংবলিত তোরণদ্বারের কারুকাজ কতই না অপূর্ব। প্রাসাদের প্রবেশ পথে রয়েছে ভুটানের রাজাকে যুদ্ধে হারানোর স্মারক - দুটি কামান। শীর্ষ গম্বুজের নীচে প্রাসাদের দরবার হলও কম আকর্ষণীয় নয়। রাজপ্রাসাদের সংগ্রহশালায় রয়েছে বিপুল ছবির সম্ভার আর প্রত্নসামগ্রী। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কোচবিহার রাজপ্রাসাদের ভেতরে একটি মিউজিয়াম তৈরি করেছে। এই প্রদর্শশালা সমগ্র উত্তরবঙ্গের গর্ব। এখানে আছে প্রাচীন চিত্রলিপি, রাজপরিবারের ব্যবহৃত সামগ্রী, প্রাচীন মূর্তি, আসবাব, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পুজো-পার্বণের উপাদান। মিউজিয়ামে ঢুকেই দেখা যায় রাজপরিবারের মূল্যবান চিত্র। রানি সুনীতি দেবী, ইন্দিরা দেবী, কোচবিহাররাজ নরনারায়ণ, নৃপেন্দ্রনারায়ণ, জিতেন্দ্রনারায়ণ প্রমুখদের তৈলচিত্র সংরক্ষিত আছে। আর রয়েছে কোচবিহার রাজাদের শাসনাধীন এলাকার মানচিত্র, শিকারের চিত্র, কোচবিহারের মন্দির ও সৌধের চিত্র, ১৯০৯-এর রাজ্যসীমা, রাজ্যের বিভিন্ন প্রত্নসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলির (গোসানিমারী, কামতাপুর) খননকার্যের ও প্রত্নবস্তুর আলোকচিত্র, বিলিয়ার্ড বোর্ড, আয়না, তালা-চাবি ইত্যাদি।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও আসবাবের ক্ষেত্রে টোটো, রাভা, মেচ, রাজবংশী জনজাতি মানুষদের ব্যবহৃত পোশাক- পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, সংগীত সরঞ্জাম বিশেষ উল্লেখ্য। এছাড়া বিষহরি,মালান,মনসা ইত্যাদির পুজোয় ব্যবহৃত উপকরণ – যেমন, চোদ্দুঙ্গ (প্রদীপ) , চেরাগবাতি, ত্রিশূল, লামা(প্রার্থনাচক্র),দেবদেবীর মুখোশ, অস্ত্র, শিকার সামগ্রী, জনজাতিদের মাছ ধরার সরঞ্জাম যেমন – টুমি, গেইতুং, তাপাই, পাললা এবং বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থুমপাচুত, গিতাং, মুখাবাঁশি, আড়বাঁশি, সানাই, দোতারা সুন্দর ভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। পাল-সেন যুগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত দুশোরও বেশি বিভিন্ন মূর্তি রয়েছে। আছে নারায়ণী মুদ্রা, যা কোচবিহাররাজ নরনারায়ণ চালু করেছিলেন। রানি ভিক্টোরিয়ার দেওয়া সাতটি পদক সংরক্ষিত আছে। মাত্র ৫ টাকা প্রবেশমূল্যে রাজবাড়ির অভ্যন্তরের ইতিহাস, উত্তরের জনজাতি ও সংস্কৃতির হদিশ মিলবে। ক্লান্ত লাগলে রাজবাড়ির সামনে বিরাট জায়গায় একটু জিরিয়ে নেওয়া যাবে। তবে সংগ্রহশালায় মোবাইল ও ক্যামেরা নিষিদ্ধ। রাতে এই রাজপ্রাসাদে আলোর খেলা চলে।

অনেকক্ষণ তো ঘুরলেন। এবারে চলুন হোটেলে ফিরি। আবার যদি পারি, পরের পর্বে আপনাদের কোচবিহার শহরের বাইরে নিয়ে যাব।

ততক্ষণ - অলবিদা।

[তথ্য ঋণ :- ইতিকথায় কোচবিহার (ডঃ নৃপেন্দ্র নাথ পাল), ইন্টারনেট, আনন্দবাজার পত্রিকা, আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ]

কোচবিহারের তথ্য

দশ বছর হলো অবসর প্রাপ্ত ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধি রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এখন গিন্নির ফাইফরমাস খাটেন আর দিনরাত বকুনি খান। বাংলা পত্রিকার আন্তর্জাল মহলে যিনি জনপ্রিয় 'ঘনাদা'-র কলমে। সদ্যপ্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'চাপড়ঘন্ট'।

www.amaderchhuti.com

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

স্বপ্নের দেশে কয়েকদিন

সুমিতা সরকার

~ অরুণাচল প্রদেশের তথ্য ~ অরুণাচল প্রদেশের ছবি ~ তাওয়াং-এর ছবি ~

ডিসেম্বরের এক সুন্দর সকালে আমরা কলকাতা থেকে রওনা দিলাম, গন্তব্য অরুণাচল। আমরা অর্থাৎ আমি, আমার স্বামী এবং কন্যা। প্রথমে গৌহাটি পৌঁছে সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে সোজা ১৮১ কিমি দূরে তেজপুর। সেখানে এক রাত থেকে পরেরদিন বেড়িয়ে পড়ি তাওয়াং এর পথে। তেজপুর থেকে ৬০ কিমি দূরে অসম-অরুণাচল সীমান্তে পড়ে ভালুকপং। জিয়াভরলি নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। ভালুকপং থেকে প্রায় ৫ কিমি দূরত্বে রয়েছে টিপি অর্কিড সেন্টার। সেখানে দুর্লভ প্রজাতির নানান অর্কিড দেখলাম। এখান থেকে গাড়ি উঠতে শুরু করল ওপরের দিকে। দু'পাশের পাহাড়ের গায়ে বিভিন্ন প্রজাতির ফার্ন, বাঁশ, কলা আর নাম না জানা গাছেদের রাজত্ব। পথে পড়ল জিরো পয়েন্ট। সেখানে রাস্তা দু'ভাগে ভাগ হয়েছে। একটা পথ গেছে ডানদিকে পূর্ব কামেং জেলার সদর শহর সেপ্পাতে, আরেকটা পথ রূপা, টেংঙ্গা ভ্যালি হয়ে পৌঁছেছে বমডিলা। উচ্চতা ৮২০০ ফুট। আমরা এপথেই বমডিলা পৌঁছে সেদিনের মতো বিশ্রাম নিলাম।

বমডিলা বেশিরভাগ সময়েই মেঘে ঢাকা থাকে। সকালের দিকে মেঘ সরে গেলে রোদে ঝলমল করে ওঠে ছোট্ট শহরটি। আমরা পায়ে পায়ে দেখে নিলাম দুটি গুম্ফা, ক্র্যাফট সেন্টার ইত্যাদি দ্রষ্টব্যগুলি। শুনেছিলাম বমডিলার কাছে পিঠে অনেক আপেল বাগানও রয়েছে। যেহেতু ডিসেম্বর মাস যেকোনো সময়ে বরফ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তাই বমডিলা থেকে খুব সকাল সকাল দিরাং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। দিরাং এখান থেকে প্রায় ৪২ কিমি।

পাহাড় ঘেরা ছোট্ট শহর দিরাং। উচ্চতা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট। চটপট দেখে নিলাম আপেল আর নাশপাতির বাগান, ইয়াক রিসার্চ সেন্টার ও উষ্ণ প্রস্রবণ। দিরাং ছেড়ে গাড়ি খানিকটা পথ যেতেই আমাদের ড্রাইভার দাদা 'সোনম' দেখালেন বরফে ঢাকা শৃঙ্গরাজি - ওই হল সেলা পাস, যার উচ্চতা ১৩,৭২১ ফুট। চলার পথে একধারে খাদ আর একধারে উঠে গেছে পাহাড়। ধীরে ধীরে আমাদের গাড়ি যত ওপরের দিকে উঠতে লাগল চোখে পড়তে লাগল পাহাড়ের গায়ে বেড়ে ওঠা ফার্ন, পাইন গাছের পাতা সব সাদা বরফে ঢাকা। পথের দু'ধারে পড়ে আছে পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো বরফ। তবে রাস্তা পরিস্কার। হঠাৎ একটা বাঁক নিতেই সামনে এলো বহু প্রতীক্ষিত সেলা পাস।

সেলা লেক

www.amaderchhuti.com

২৪ শে ডিসেম্বর, ২০১১। সময় বিকেল পাঁচটা। দাঁড়িয়ে আছি ইতিহাস-ভূগোল খ্যাত সেলা পাসে। একদিকে সেলার আত্মত্যাগের গল্পকথা মনে পড়ছে আর অন্যদিকে উচ্চতার রোমাঞ্চ। বেশ একটা অদ্ভুত ভাললাগা ছড়িয়ে যায় সারা শরীরময়। সেলা গেট পার হয়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো সেলা লেকের ধারে। অবাক বিস্ময়ে আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ। একি! পুরো লেকটাইতো জমে বরফ! এখানে দুটো লেক আছে, দুটোই জমে গেছে। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়ি এই অপার্থিব সৌন্দর্যকে মন ক্যামেরায় বন্দি করে রাখতে। যদিও অতিরিক্ত উচ্চতার একটা কষ্ট থাকে কিন্তু হোমিওপ্যাথি ওষুধ কোকা ৩০ এবং মনের উত্তেজনা শরীরের ক্ষমতা যেন হঠাৎই বাড়িয়ে দিয়েছে। সোজা নেমে গেলাম বরফ জমা লেকের ওপরে এবং অবিশ্বাস্য মনে হলেও লেকের ওপরে দাঁড়িয়ে ছবিও তোলা হোল।

আমাদের ড্রাইভার দাদা এরপর গাড়ি দাঁড় করালেন সেলা পাস থেকে একটু নেমে চায়ের এক ছোট্ট দোকানে। সেখানে গরম গরম চা খেয়ে শরীরের যেটুকু কষ্ট হয়েছিল তাও মুহূর্তে উধাও। গাড়ি এবার উতরাই পথ ধরে পৌঁছাল এক ঝরনার ধারে। ওমা, ঝরনাও যে জমে বরফ! নামটিও বেশ। জং ফলস।

এগিয়ে চললাম যশবন্তগড়ের দিকে। বীর সৈনিক যশবন্ত সিং রাওয়াতের স্মৃতি মন্দির। চিন -ভারত যুদ্ধের সময় ১৯৬২ সালে চিনা সৈনিকদের আক্রমনের সময় এই সেনাচৌকি দীর্ঘক্ষণ আগলে রেখে বীরের মৃত্যু বরণ করেন যশবন্ত। এঁরই প্রেমিকা ছিলেন সেলা। শোনা যায় ভারতে ঢোকার গোপন রাস্তার কথা তিনি জানতেন। তাই চিনা সৈনিকরা যখন তাঁর পিছু নেয়,পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন সেলা। যশবন্ত গড়ে গিয়ে জানা গেল, যশবন্ত সিং এমন একজন সৈনিক যিনি মৃত্যুর পরেও বেতন পান এবং যার উন্নতিও হয় কারণ অন্যান্য সৈনিকদের এবং সেনাবিভাগের মতে তিনি এখনও "অন ডিউটি"। এখানকার পাহাড়ি বাতাসে সেলা-যশবন্তের প্রেম আর বীরত্বের কাহিনি আজও যেন ভেসে বেড়ায়।

এরপর আমাদের গাড়ি আবার চড়াইয়ের পথ ধরল। সন্ধ্যে নাগাদ দেখতে পেলাম তাওয়াং এর গেট । ছোট্ট সুন্দরী তাওয়াং। জায়গা মিলল হোটেল সামদ্রুপ্লিং-এ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় লেপের তলায় খুঁজে পেলাম ওম। রুম সার্ভিসে চলে এল গরম ধোঁয়া ওঠা কফি আর পকোড়া। শরীরে যেতেই আবার সব চাঙ্গা। বেড়িয়ে পড়লাম। হোটেলের সামনেই ছোট্ট একটা বাজার। আলপিন থেকে সোয়েটার - সবকিছুই পাওয়া যায়। হোটেলের নীচেতেই আবার মিলিটারি পোশাক-আষাকের দোকান। মেয়ের আদুরে বায়নায় কেনা হোল মিলিটারি ক্যাপ। এছাড়াও চেনা-পরিচিতদের জন্য কিছু উপহার। এখানে বেশ তাড়াতাড়ি রাত নামে, তাই আমাদেরও চটপট ঘরে ঢুকে পড়তে হল। হোটেলের ম্যানেজার জানালেন কাল সকাল ৮ টায় গাড়ি আসবে। ঘুরে দেখব তাওয়াং।

ঝরনা যখন স্তব্ধ - জং ফলস

সকাল সকাল ঘুম ভাঙল। এসে দাঁড়ালাম বারান্দায়। চোখ জুড়িয়ে গেল অরুণাচলের লুকোনো স্বর্গকে দেখে। অরুণাচলিরা সাধারণত নিজেদের জাতীয় পোশাকেই স্বচ্ছন্দ। হঠাৎ চোখ গেল দূরের পাহাড়ের গায়ে রাস্তায় সার দিয়ে চলেছে মিলিটারি ভাইয়েরা। মন যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল।

সম্বিৎ ফিরল কর্তার ডাকে - "গাড়ি এসে গেছে, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও"। ব্রেকফাস্ট সারা হয়ে গিয়েছিল। চটপট জ্যাকেট সোয়েটার চাপিয়ে বেড়িয়ে পড়া গেল। প্রথম গন্তব্য তাওয়াং থেকে ১৬ কিমি দূরে প্রায় ১৪৭০০ ফিট উচ্চতায় পিতি সো । পথে পড়ল মিলিটারি ক্যাম্প। সেখানে আই এল পি অর্থাৎ পারমিট দেখাতে হোল। এরপর শুরু হোল সেই রাস্তা যে রাস্তার প্রত্যেক বাঁক ঘুরলেই খুলে যাচ্ছিল একটার পর একটা রহস্যের দরজা। কোনও বিশেষণেই যেন মন ভরছিল না। ক্যামেরার লেন্সে বন্দি করছিলাম এই অপার সৌন্দর্য। এসব মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে কখন যেন পৌঁছে গেলাম পিতি সো। চারদিকে পাহাড় ঘেরা এই লেক এখন জমে বরফ। আশেপাশে ছড়িয়ে আছে পেঁজা বরফ। লেকের জলে থুড়ি বরফে ছায়া পড়েছে পাশের পাহাড়ের। অসাধারণ মনোমুগ্ধকর সে দৃশ্য। সবাই নেমে গেলাম লেকের ধারে। বরফ নিয়ে খেলা শুরু হল। দুঃসাহসে ভর করে কিছুটা হেঁটে এলাম লেকের জমে যাওয়া বরফের ওপর দিয়েও। কিছু সময়ের জন্য হলেও এই স্বর্গীয় পরিবেশ যেন আমাদেরও ছেলেবেলাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, ভুলিয়ে দিয়েছিল সংসারের কঠিন বাস্তবকে। এবার এগিয়ে চললাম সাঙ্গেসার লেক অর্থাৎ জনপ্রিয় মাধুরী লেক দেখতে।এখানে এক একটা বাঁক ঘুরলেই দেখা মেলে এক একটি অপূর্ব সুন্দর লেক। কোনটার আধা বরফ আধা জল, কোনটায় শুধুই জল(পবিত্র লেক), কোনটা পুরো দুধ সাদা বরফে ঢাকা। বরফ আর বরফ। চারদিকে শুধু সাদা -কালোর রাজত্ব। পৌঁছে গেলাম সাঙ্গেসার লেক। এই লেকের বিশেষত্ব হল লেকের জলের ভিতর থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গাছের কাণ্ড। শোনা যায়, এক সময় ভূমিকম্পে গাছে ভরা পাহাড় নীচে বসে যায় এবং তা জলে পূর্ণ হয়ে তৈরি হয় এই লেক।

পবিত্র লেক

শহরে ফিরে এসে চললাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে। এবারে দ্রষ্টব্য তাওয়াং মঠ আর ওয়ার মেমোরিয়াল। মঠের বুদ্ধমন্দিরে রয়েছে ২৬ ফুট উঁচু বুদ্ধমূর্তি। বাইরের দেওয়ালে নানা উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করে আঁকা রয়েছে বুদ্ধদেবের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা। এখানকার মিউজিয়ামটিও দেখার মত। এরমধ্যে সযত্নে রক্ষিত তিনশো থেকে হাজার বছরের পুরনো পুঁথি, বৌদ্ধ লামাদের ব্যবহৃত জিনিষ, পুরনো বাসনপত্র, থাঙ্কা। রয়েছে দুটি বিশাল হাতির দাঁত, কাঠের মুখোশ ইত্যাদি সব বহুমূল্য জিনিষ। এই মঠের থেকে দাঁড়িয়ে পুরো তাওয়াং শহরকে দেখা যায়।

এর পর যাওয়া হল ১৯৬২ সালে নিহত ভারতীয় সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে নির্মিত ওয়ার মেমোরিয়ালে। এখানে শোভা পাচ্ছে বোফর্স কামান। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরলাম হোটেলে। মন কানায় কানায় পূর্ণ।

এবার ফেরার পালা। ঠিক করেছিলাম হেলিকপ্টারে ফিরব। সেইমত পরেরদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম হেলিপ্যাডে। পবনহন্স হেলিকপ্টার। চেকিং পর্ব সেরে মনের মধ্যে এক অদ্ভুত উত্তেজনা নিয়ে উঠে পড়লাম। ঘণ্টা দুয়েকের সেই অসাধারণ উড়ান সারা জীবনের সম্পদ। পাখির চোখে দেখলাম ভুটানের নদী জঙ্গল পাহাড়, ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা। গৌহাটি বিমানবন্দরে নেমে মনে হল যেন স্বপ্নের জগত থেকে বাস্তবে পা দিলাম ।

www.amaderchhuti.com

যশবন্ত গড়

তাওয়াং মঠ

~ অরুণাচল প্রদেশের তথ্য ~ অরুণাচল প্রদেশের ছবি ~ তাওয়াং-এর ছবি ~

নৃত্য বিশারদ সুমিতা ভালবাসেন বই পড়তে ও গান শুনতে। ঘর সামলানোর ফাঁকে অবসর আর সুযোগ পেলেই সপরিবারে বেড়িয়ে পড়েন অচেনা অদেখা প্রকৃতির অমোঘ টানে।

ঢাকা থেকে সিমলা

তুহিন ডি. খোকন

~ হিমাচল প্রদেশের তথ্য ~ হিমাচল প্রদেশের আরো ছবি ~

একেবারে হঠাৎ করেই ট্যুর প্ল্যানটা। ভারতীয় হাই কমিশনারের জারিকৃত নতুন নিয়মে ই-টোকেন রেজিস্ট্রেশন করলাম ৭ তারিখে। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়াতে কর্মরত বন্ধু নিউটনের কল্যাণে ভিসা সংক্রান্ত ভোগান্তি অনেকটাই লাঘব হলো। ১৪ তারিখ বিকেলে প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যেই বন্ধু নোমান তার পরিবার ও আমার পরিবারের ভিসা সম্বলিত পাসপোর্টগুলো সংগ্রহ করলো। এরমধ্যে কলকাতা প্রবাসী এক আত্মীয়কে ফোনে শিয়ালদহ-দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেসে টিকিট করতে বললাম। পরদিন দুপুর বারোটা নাগাদ 'তৎকাল স্কিমে' টিকেট কনফার্মেশন ম্যাসেজ পেলাম। ছুটলাম সোহাগ কাউন্টারে, যেতে যেতে ফোনে নোমানকে ডেকে নিলাম। বাস কাউন্টারে গিয়ে দেখলাম সুবিধাজনক কোন সিটই নেই। এদিকে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেসের সাথে সময় মেলাতে গেলে একেবারে টায়েটায়ে হয়ে যাচ্ছে। এক ঘণ্টার নোটিশে দু'জন যার যার মিসেসকে খবর দিলাম ইমার্জেন্সি ব্যাগ গোছাতে। সময় যেখানে অতি সংক্ষিপ্ত সেখানে বাস কাউন্টার থেকে বাসায় ফেরার জন্যে রিকশা অথবা সিএনজি কিছুই যেতে রাজি হচ্ছিল না। বিকেল ৪.৩০ টায় বাস, হাতে সময় আছে মাত্র চল্লিশ মিনিট। কিছুটা দৌড়িয়ে, কিছুটা হেঁটে, কিছুটা রিকশায় চড়ে শেষে বাসায় যখন পৌঁছালাম তখন বাজে ৪-০৫। স্ত্রী-কন্যাকে অনেকটা বগলদাবা করেই কোনক্রমে বাস স্টেশনে পৌঁছালাম। ততক্ষণে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে আরও পাঁচ মিনিট বেশি হয়ে গেছে। কোনক্রমে লাগেজ বুথের এন্ট্রি শেষ করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের নির্দিষ্ট সিটে হেলান দিতেই শরীর প্রায় অবশ হয়ে এলো। বুঝলাম বয়স এবং টেনশন দুটোই মারাত্মক হয়ে দেখা দেয় এসব আন-সার্টেন ট্যুরে।

প্রায় পৌনে বারটা নাগাদ বাস বেনাপোলে পৌঁছালো, তড়িঘড়ি ইমেগ্রেশন-কাস্টমস সম্পন্ন করলাম। ওপারে অপেক্ষমান বাসে উঠে দু'ঘণ্টার মধ্যে মধ্যমগ্রামে সোহাগের ব্যবস্থাপনায় ও নিজের টাকায় প্রথম ভারতীয় লাঞ্চ খেলাম। পাঁপড়, দু'বাটি ভাত, কসানো মাংস আর কাঁচা পেঁয়াজ। চরম ক্ষুধায় তাই অমৃত মনে হলো। ঠিক তিনটায় কলকাতার মারকিউস স্ট্রিট সংলগ্ন সোহাগ কাউন্টারে বাস দাঁড়াল। হোটেল ওরিয়েন্টাল - আপাতত আমাদের রাতঠিকানা।

সন্ধ্যায় বেরোলাম আশপাশের এলাকা পরিদর্শনে। পাশেই নিউমার্কেট এলাকা, আমার ও নোমানের স্ত্রীর জোরাজুরিতে সেখানেই গেলাম। টুম্পা ও ফারহানা ভাবি বিপুল উৎসাহে শপিংয়ে ব্যস্ত। আমি আমার মেয়ে কান্তম ও নোমান তার দু'মেয়ে ইসাবা ও আরিনাকে সাথে নিয়ে নিউমার্কেট চত্বরের নিয়ন আলোতে দাঁড়িয়ে আছি। নিয়ন আলোর হলুদ আভায় বড্ড অদ্ভুত লাগছে দুশো বছরের পুরাতন কলকাতা নগরী। তাড়াহুড়ায় ফেলে আসা চটি জুতা আর সানগ্লাস কিনে নিলাম বেশ সস্তায়। নিকটস্থ 'রাঁধুনি রেস্তোরাঁয়' রাতের খাওয়া শেষে হোটেলে ফিরে পরদিনের পরিকল্পনায় বসলাম। পরে টিভি দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না!

www.amaderchhuti.com

বহুদিনের অভ্যাস তাই ভোর পাঁচটাতে ঘুম ভাঙলো। চপটপ শর্টস ও জগিং সু পরে রাস্তায় নামলাম। রাতজাগা কলকাতা নগরী তখনও ঘুমে। মিনিট বিশেক হেঁটে হোটেলে যখন ফিরলাম আমার স্ত্রী ও কন্যা তখন জেগে গেছে। হালকা নাস্তার অর্ডার দিলাম। আটটায় ব্রেকফাস্ট। নাস্তা শেষে শর্ট ডিস্টেন্সের দর্শনীয় স্থান দেখার প্রস্তাব এলে নোমান দম্পতি চলে গেল ভিক্টোরিয়াল মেমোরিয়াল দেখতে। সাড়ে এগারটা নাগাদ নোমান এলে পাসপোর্টসহ গেলাম ফেয়ারলি প্লেসে দিল্লি টু কালকার টিকিট করতে। ফরেনার কোটায় সবক'টা টিকিট পেয়ে গেলাম নির্দিষ্ট দিনের।

বেলা সোয়া চারটায় রাজধানী এক্সপ্রেসে পা রাখলাম জীবনে প্রথমবারের মতো। সেন্ট্রাল এসি ট্রেন - আমাদের সিট থ্রি টায়ারে। কাঁটায় কাঁটায় ৪.৫৫ মিনিটে গাড়ি ছাড়লো। নিজেদের ও সহযাত্রীদের সাথে গল্পগুজব করতে করতেই মোটামুটি ছাব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। আমি ও নোমান ছাড়া বাকি সবার এটিই প্রথম দূরপাল্লার ট্রেন ভ্রমণ। তাই তাদের মনে অনেক চমক, অনেক বিস্ময় লাল রঙের এই ট্রেনকে ঘিরে। পরদিন দুপুর দেড়টায় দিল্লি পৌঁছতেই কুখ্যাত 'ড্রাই হট ওয়েদারের' মুখোমুখি হলাম। ৪৩ ডিগ্রি তাপমাত্রায় প্ল্যাটফর্মে পা দিতেই মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। কেউই একটুও ঘামছি না কিন্তু প্রচন্ড রোদ আর গরম হাওয়ার দাপটে পোশাকের বাইরের আবরণহীন ত্বকে জ্বালা ধরে যাচ্ছে। ভাবলাম এখানে মানুষ থাকে কেমনে! যতটা দ্রুত সম্ভব শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওয়েটিং রুমে সবাইকে রেখে নোমান আর আমি দুরন্ত এক্সপ্রেসে দিল্লি-কলকাতা ফেরার টিকিট কেটে নিয়ে পুরানো দিল্লিতে যাবার জন্যে ট্যাক্সি ঠিক করতে বেরোলাম। এর মধ্যে সুযোগসন্ধানী এক ট্রাভেল এজেন্টের খপ্পরে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। পুরানো দিল্লি পৌঁছে স্টেশন সংলগ্ন বিখ্যাত ম্যাকডোনাল্ডে লাঞ্চ খেলাম সবাই। লাঞ্চ সারতে সারতে বেলা তিনটা বাজলো। বাইরের ভয়াবহ তাপদাহ থেকে বাঁচতে তড়িঘড়ি আশ্রয় নিলাম স্টেশনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওয়েটিং রুমে। ছ'টার দিকে রোদ একটু পড়ে এলে নোমান প্রস্তাব দিল কাছেই দিল্লির লালকেল্লা দেখে যেতে। মালপত্র স্টেশনের লাগেজ রুমে গচ্ছিত রেখে রিকসা করে বেরিয়ে পড়লাম।

দিল্লির লালকেল্লা। সতেরশ' শতাব্দিতে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের প্রতিষ্ঠিত সুবিশাল দুর্গ। মূল ফটক দিয়ে ঢুকতেই চোখে পড়লো দু'পাশের সারিবদ্ধ অ্যান্টিক ও স্যুভেনির শপগুলো। রকমারি-বাহারি পণ্যে সজ্জিত। মূল দুর্গের ভেতরে দেওয়ান-ই-আলম। দেওয়ান-ই-খাস, নুর-ই বেহেশত, জেনানা, মতি মসজিদ, বক্স বাগসহ অন্যান্য প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন দেখা শেষে খোলা প্রান্তর ও জলাশয়ের কাছে গিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল।

পাহাড়ি ছোট রেল স্টেশন কালকা। অনেকটা মফসসলি ট্রেন স্টেশনের মতো। এখান থেকে সড়ক পথে সিমলা ৮০ কিলোমিটার। ছোট গাড়ি বা জিপে সাড়ে তিন ঘণ্টা। পর্যটকদের জন্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে ১৯০৩ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক চালু করা টয় ট্রেন। তবে 'শিবালিক এক্সপ্রেস' বা 'হিমালয়ান কুইন' নয়, সময়ের স্বল্পতার জন্য একটা 'টাটা ইন্ডিকা' ভাড়া করলাম। আমাদের যাত্রা হলো শুরু।

সিমলা - ১৮৬৪ সালে হিমাচল প্রদেশের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি পায়। 'কুইন অব হিল' নামে পরিচিত এই পাহাড়ি শহর তৎকালীন ব্রিটিশ রাজাদের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে পরিগণিত হতো। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ২২০৫ মিটার বা ৭২৩৪ ফুট। আমাদের গাড়ি প্রায় ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার গতিতে চললেও চারদিকের নয়নাভিরাম পাইন ও ওক গাছের ঘন জঙ্গল মুহূর্তেই মনে অভিযাত্রী ভাব এনে দিল। উপভোগ্য কোমল শীতল হাওয়া যাত্রাপথের ক্লান্তি অনেকটাই দূর করে দিচ্ছে। প্রায় ১১টা নাগাদ সিমলা মূল বাস স্টেশন সংলগ্ন হোটেল পাড়ায় পৌঁছলাম। আমাদের ড্রাইভারের প্রদর্শিত কুলিদের দেখে বেশ আশ্চর্য হলাম। লাল চামড়ার দীর্ঘদেহী সুদর্শন এই যুবকগুলোই নাকি এখানকার কুলি! পোশাকে আশাকে অনেকটা কাশ্মিরী। আমাদের ড্রাইভার ইশারা করতেই তারা বেশ সহজভাবেই আমাদের মালপত্তর তুলে নিয়ে হোটেল দেখাতে নিয়ে চলল। মূল বিড়ম্বনার শিকার হলাম এখানেই। প্যাকেজ ছাড়া এবং কোন ট্রাভেল এজেন্টের মাধ্যম ছাড়া হোটেল পাওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। প্রায় দু' ঘণ্টা খুঁজে ছাব্বিশ হাজার টাকার চুক্তিতে 'সিমলা (লোকাল সাইড সিয়িং) -মানালী- ধর্মশালা- ডালহৌসি' প্যাকেজ ঠিক করলাম এক স্থানীয় ট্রাভেল এজেন্টের মাধ্যমে। প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত একখানা টাটা সুমো জিপ, সাথে ড্রাইভার আর মাঝারি হোটেল থাকার ব্যবস্থা। খাওয়া দাওয়া ও শপিং খরচ আমাদের নিজেদের। দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুম ঘুম ভাব চলে এলো। রুমের বিশাল জানালা দিয়ে অর্ধেক বরফে মোড়া ফাগু-সিমলার পাহাড় দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পেলাম না। দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজে ঘুম ভেঙে দেখি বিকাল ৪টা। আমাদের ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে হোটেলের বাইরে অপেক্ষা করছে। ইতিমধ্যে শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। কম্বলের আরামদায়ক উষ্ণতা ছেড়ে বেরোতে ইচ্ছে হলো না। তবুও মনের টানে ঘর ছাড়লাম।

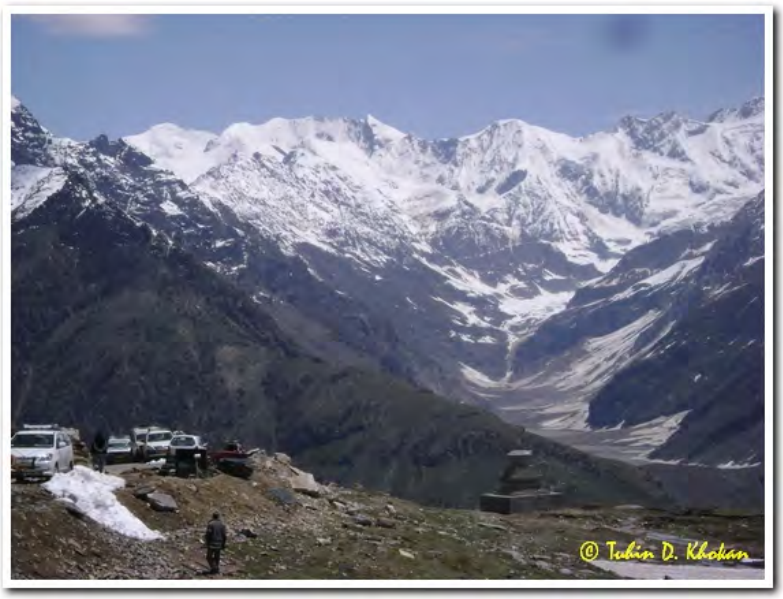

বাইরে বেরিয়ে মনটা বেশ প্রশান্ত হয়ে গেল। মরে আসা রোদে তীব্র সুনীল আকাশ আর তার নীচে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের টিউডর রিভাইভাল নিও- গথিক আর্কিটেকচারে গড়ে তোলা বিল্ডিং ও ঘরবাড়ির মাঝে দাঁড়িয়ে নিজেদের বড্ড আগন্তুক মনে হলো। বাংলাদেশ ছেড়ে এত হাজার মাইল দূরের এই সিমলা শহরের সৌন্দর্য উন্মুখ করে তুলল সবাইকে। আমাদের গাইড কাম ড্রাইভার চব্বিশ বছরের এক স্থানীয় যুবক, নাম বিনোদ। বেশ হাসিখুশি, মজার কথাবার্তা চালাতে পারে সাবলীল হিন্দিতে। বিনোদের মূল কারিশমা টের পেলাম দুর্গম ও মারাত্মক বিপদসঙ্কুল পাহাড়ি পথে তার অসাধারণ ড্রাইভিং নৈপুণ্য দেখে। ট্যুরের সাতদিনই সে আমাদের সঙ্গে ছিল।

প্রথমে গাড়ি নিয়ে আমরা গেলাম সিমলা ট্রেন বুকিং-এ। পাঠানকোট টু নয়াদিল্লির টিকিট কেটে নিলাম। তারপর চললাম প্রায় ৮৬০০ ফুট উঁচুতে কুফরিতে। সিমলা শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৪ কিলোমিটার। কুফরি যাওয়ার পথে 'হিমালয়ান ওয়াইল্ড লাইফ -জু' পড়লেও সময়ের অভাবে কয়েকটি হিমালয়ান ভাল্লুক ও একটি চিতা ছাড়া অন্য কিছু দেখার সৌভাগ্য হলো না। আশপাশের মধ্যে কুফরির চূড়াই সর্বোচ্চ। গাড়িপথ শেষ হবার পর এবার আমরা চারটি ঘোড়া ভাড়া নিলাম কুফরির চূড়ান্ত চূড়া বা পিক 'মাহাষু'-তে ওঠার জন্যে। খাড়া পাহাড়ি পথ, কাদা-পাথর ও ঘোড়ার বিষ্ঠায় একাকার। এসব তুচ্ছ করে অজানাকে জানার আগ্রহ আমাদের ক্রমশ উৎসাহ জোগাচ্ছিল। প্রথমে ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় নিজেকে ওয়েস্টার্ন ছবির তারকা 'ক্লিন্ট ইস্টউড' মনে হচ্ছিল। যদিও পথের দুর্গমতায় এই 'ভাব' কিছুক্ষণের মধ্যেই ছুটে গেল। এক পাশে খাড়া পাহাড়ের প্রাচীর, অন্যপাশে জঙ্গলঘেরা গভীর খাদ যেখানে কোন কারণে যদি কেউ পড়ে তো সেনাবাহিনী দিয়ে লাশ তোলাতেও সপ্তাহ খানেক লেগে যাবে। কখনও একেবারে খাড়া আবার কখনও একেবারে নীচু বন্ধুর পথে আমাদের প্রশিক্ষিত ঘোড়াগুলো ধীরে ধীরে গন্তব্য পাহাড় চূড়ায় পৌঁছে দিল। ঘোড়া থেকে নেমে আমরা আশপাশ ঘুরে দেখতে বেরোলাম।

যদিও গ্রীষ্মকাল, পাহাড়চূড়ার শীতাতুর আবহাওয়া তা ভুলিয়ে দিল। ছোটবেলায় ইংরেজি বর্ণমালা শেখার সময় Y-তে ইয়াক পড়েছিলাম, ছবিও দেখেছিলাম। কুফরির এই পাহাড় চূড়ায় দেখি সত্যি সত্যি দুটি ইয়াক সুবিশাল দেহে কালো লোমের ঝালর ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই তাদের সহিস। মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকায় পিঠে চড়ে ছবি তোলা যাবে। প্রথমে বেশ আগ্রহ নিয়ে কাছে গেছিলাম ছবি তুলব বলে, কিন্তু ফুট দশেক দূর থেকেই ইয়াকের গায়ের তীব্র বোটকা গন্ধ ব্যাপারটাকে অসাধ্য করে তুলল। পরিবর্তে ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্ট পার্ক ও চিনি বাংলো দেখে ঘোড়ায় চড়ে ফিরতি পথ ধরলাম।

বিকেল প্রায় শেষের দিকে। পথে গাড়ি থামিয়ে হাজারো ফার ট্রিতে ছাওয়া গ্রিন ভ্যালি দেখলাম। এর স্থানীয় নাম চপল। সবুজের এই অফুরন্ত সৌন্দর্য যে কোন পর্যটককে বিমোহিত করবে। পুরো উপত্যকা যেন ফারের কার্পেট বিছানো!

কুফরি থেকে সিমলা শহরে যখন ফিরলাম তখন আকাশ প্রদীপ নিভে গেছে। পাহাড়ের খোপে খোপে বসতবাড়ির আলোগুলোকে মনে হলো যেন টুনি বাল্ব বা এক ঝাঁক তারা পাহাড়ের গায়ে জাঁকিয়ে বসে ঝিকমিক করছে।

www.amaderchhuti.com

পরদিন সকালে মানালির উদ্দেশ্যে আমরা যখন বেরোলাম তখন কাঁটায় কাঁটায় দশটা। সিমলা থেকে কুলুর দূরত্ব ২১০ কি.মি আর মানালি ২৬০ কি.মি। দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল পাহাড়ি পথ। রওনা হওয়ার ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে প্রচণ্ড রোদ জিপের ভেতরটাকে একেবারে নরক করে তুললো। ঘোর গ্রীষ্মকাল। বিনোদ জানালো গত দু'মাসে মাত্র একবার বৃষ্টি হয়েছে এখানে। তাই পাহাড়ি এই জনপদ একেবারে ধুলোয় ধূসরিত। গরমে-ঘামে ও ধুলোয় সবাই অস্থির হয়ে উঠল। বেলা দেড়টা নাগাদ ধরলা ঘাট, বিলাসপুর ও সুন্দরনগর ফেলে আমরা উপস্থিত হলাম মান্ডি শহরে। আশেপাশের শহরগুলোর মধ্যে আয়তন ও জনসংখ্যায় মান্ডি অন্যতম। চার চারটি ন্যাশনাল হাইওয়ের জংশন শহর বিলাসপুরের পরই এর অবস্থান। খাবারের সময় হয়ে গিয়েছিল তাই সবাই মিলে এখানেই লাঞ্চ সারলাম।

সিমলা শহর থেকে এতক্ষণ আমরা উত্তর-পূর্ব দিকে যাচ্ছিলাম, মান্ডি থেকে গাড়ি এবার ঘুরে গেল উত্তর-পশ্চিমে। এখানেই দেখা মিললো হিমালয়ের বরফ গলানো স্বচ্ছ তোয়া বিয়াস নদীর। বিয়াস পাহাড়ি খরস্রোতা পাথুরে নদী; এর কোথাও অত্যধিক গভীরতা আবার কোথাও বা হাঁটুজল। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এ সমস্ত বড় বড় পাথরগুলোও পাহাড়ি স্রোতের সাথে নেমে এসেছে হিমালয় থেকে। অপেক্ষাকৃত নীচু পাড়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সকলে ঘাম ও ধুলোয় মাখা হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম।

গাড়ি ঢুকলো বিশাল এক পাহাড়ি টানেলের মধ্যে -দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় কিলোমিটারেরও বেশি। বিনোদ বলল এখান থেকে মাইল পাঁচেক সামনে রাইসান নামক এক জায়গায় র‍্যাফটিং এর সুব্যবস্থা আছে এবং তা আমাদের পাশে পাশে বয়ে চলা এই বিয়াস নদীতেই। আধঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছে 'হোয়াইট ওয়াটার র‍্যাফটিং' ও 'রেপলিং এন্ড রিভার ক্রসিংয়ের' বিশাল আয়োজন দেখে চমৎকৃত হলাম। নদীপাড়ের পাইনের ফাঁকে ফাঁকে প্রায় পাঁচ ছয়টি র‍্যাফটিং জোন গড়ে তুলেছে কয়েকটি কোম্পনি। নদীর পানি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হওয়াতে শুধুমাত্র মধ্য এপ্রিল থেকে জুনের শেষ নাগাদ এই রেপলিং ও র‍্যাফটিং চালু থাকে। উজানপথে প্রতিবার র‍্যাফটিংয়ে মোটামুটি প্রায় ১৪ কি.মি. পর্যন্ত ভাসা যায়। পুরু রাবারের একটি বোটে একসাথে চারজন আরোহী ও একজন ইনস্ট্রাকটর থাকে। খরস্রোতের তীব্র টান, নদীতে বিছিয়ে থাকা ধারালো পাথর ও ঠাণ্ডা জল মুহূর্তের অসতর্কতায় বড়সড় বিপদ ঘটাতে পারে। নিরাপত্তার জন্য থাকে শক্ত হেলমেট, লাইফজ্যাকেট ও রাবারের তৈরি বিশেষ পোশাক। এরপরও হর হামেশা দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে।

মধ্য বিকেলে কুলু শহরের ভেতর যখন আমরা প্রবেশ করলাম তখন কুলুর স্পেশাল লেডিস শালের কারখানা ও মার্কেট দেখে শপিং স্পেশালিস্ট ফারহানা ভাবি দারুণ উত্তেজিত। তার এখনই এসব মার্কেটে ঢোকা চাই। মহিলাদের শালের দোকানে পাঠিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে আমি ও নোমান চললাম আশ-পাশে হেঁটে বেড়াতে। বেশি দূর যেতে হলো না। এক গৃহস্থের আঙ্গিনায় ফলে ভরন্ত দুটি আপেল গাছ (জীবনে প্রথমবার) দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। বাড়িওলার অনুমতি নিয়ে গাছের নিচে পড়ে থাকা কাঁচা কয়েকটি কুড়িয়ে নিলাম; গাছের ধরন, পাতা ও কুঁড়ির প্রকৃতি ও অপেক্ষাকৃত পরিণত ফলগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলাম খাঁটি বোটানিস্টের মতো। বিনোদ জানালো সামনেই মানালিতে অসংখ্য আপেল বাগান দেখতে পাব।

কুলু থেকে মানালির দীর্ঘ ৪০ কি.মি পথ নয়নাভিরাম শীতকালীন অর্কিড, অগণিত আপেল ও পালামের বাগান, ফার ও আলপাইন ট্রির সবুজের মধ্যেই অতিক্রান্ত হলো। বিকেল প্রায় শেষ, সূর্য ডুবুডুবু, এরই মধ্যে দেখা মিললো অপরূপ শোভা বেষ্টিত কয়েকটি তুষার শুভ্র পর্বত চূড়ার। এরই মধ্যে সূর্যের শেষ রশ্মিতে সেগুলো উজ্জ্বল-গাঢ় সোনালি, কোনটা রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ আমরা মানালিতে ঢুকলাম। হোটেল পাড়া ও ম্যল চত্বরের যানজট পেরিয়ে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হোটেলে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত আটটা।

বালিশের পাশে রাখা মোবাইলের অ্যালার্মে গভীর ঘুম একটু একটু হালকা হতে লাগলো। মনে হলো এই মাত্র তো ঘুমিয়েছি! দশ সেকেন্ড পর ফের অ্যালার্মের কর্কশ শব্দে সচকিত হয়ে উঠলাম, মোবাইলের উজ্জ্বল ডিসপ্লেতে তখন ভোর চারটে।পাঁচটায় আমাদের বেরোবার কথা - রোটাং পাসের উদ্দেশে। হোটেলের গাড়ি বারান্দায় যখন নামলাম তখন সবে পুব আকাশ ফিকে হতে শুরু করেছে। দেখি বিনোদ এরই মধ্যে চালকের আসনে সওয়ারি। সবাই ঝটপট গাড়িতে উঠে পড়লাম। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে সবগুলো কাচ তুলে দেওয়া হলো। এক-দেড় কিলোমিটার গিয়েই বিনোদ গাড়ি থামালো। কারণ জিজ্ঞেস করতে জানালো, যে কাপড়-চোপড় ও জুতা আমরা পরেছি তা স্নো-পয়েন্ট রোটাং পাসের জন্যে মোটেও উপযুক্ত না। রাস্তার দু'পাশের পোশাকের সারিবদ্ধ দোকান দেখিয়ে বললো এখান থেকেই বিশেষ পোশাকগুলো ভাড়া নিতে হবে। সারিবদ্ধ দোকানগুলোতে এবার মনোযোগ দিলাম। আইস-স্কেটিং এর বিশেষ সরঞ্জাম, পোশাক ও বরফে চলার জুতো সাজিয়ে রাখা প্রতিটি শপে। স্থানীয় মধ্যবয়স্কা এক দোকানির কাছ থেকে অনেক দরদাম করে পোশাক ও জুতো এবং এক জোড়া আইস স্কেটিং সরঞ্জাম ও ইনস্ট্রাকটর ভাড়া করলাম। ফের চলা শুরু হলো। ইতিমধ্যে তুষার ধবল পাহাড় চূড়ায় উঁকি দিল সূর্য। রক্তিম আভায় হাজারো অজানা পাখির কলরব ও দিগ্বিদিক ওড়াউড়িতে মনে হলো অজানা কোন স্বর্গে এসে পৌঁছেছি। যতই আলো ফুটছে ততই শ্বাসরুদ্ধকর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের মধ্যে নিজেদের আবিষ্কার করতে লাগলাম আমরা। চারদিক বরফ আবৃত পর্বত চূড়া, অর্কিড ও আপেল বাগান, চিরসবুজ দেবদারু ও পাইনের ঘন বন - নৈসর্গিক স্থান। বিনোদ জানালো এই একই পথ দিয়েই কাশ্মীর উপত্যকার লাহুল, স্পিতি ও কিন্নরে যাওয়া যায়।

www.amarboi.com

পথের দুর্গমতার কারণে ধীরে ধীরে চলছে আমাদের জীপ, লক্ষ্য ৪১১১ মিটার বা ১৩৪০০ ফুট উঁচুতে স্নো-পয়েন্ট রোটাং পাস। মানালি শহর থেকে প্রায় ৫১ কি.মি. উত্তরে এর অবস্থান। বছরের অন্যান্য সময় প্রায়ই বন্ধ থাকে এ পথ, বরফ ও বৃষ্টির কারণে। তখন শুধুমাত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনুমতিক্রমে এবং রোড ক্লিয়ারেন্স এর প্রেক্ষিতে সেখানে যাওয়া যায়। এই একই পথ ধরে লে-লাদাখ হয়ে জম্মু কাশ্মীরেও পৌঁছান যায়। পথের একপাশে খাড়া পাহাড় প্রাচীর, অন্যদিকে গভীর খাদ সমৃদ্ধ সংকীর্ণ এই রাস্তা।

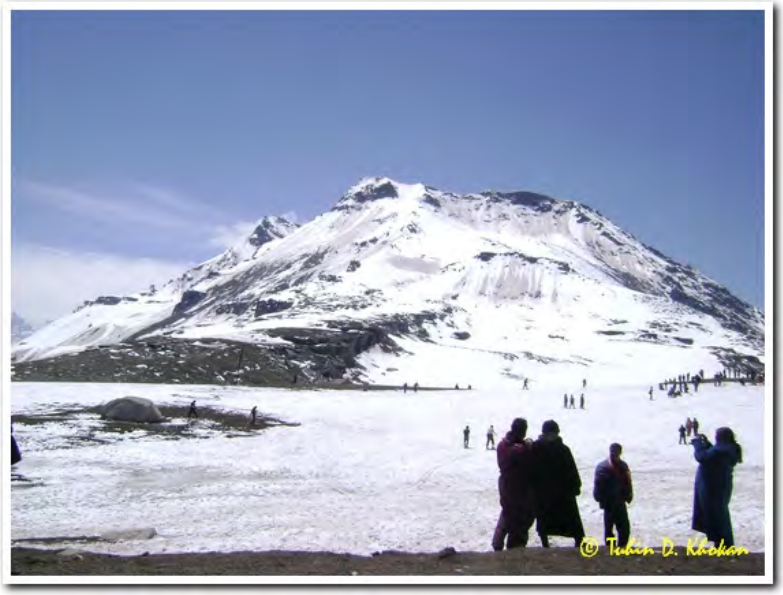

খাড়া পথ ধরে আমাদের জীপ উঠছে, যতই উঠছে বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঠাণ্ডার প্রকোপ। ঘন্টা দু'য়েক বিরামহীন ওঠার পর স্পষ্টত অক্সিজেনের অভাব টের পেলাম। সবারই শ্বাস নিতে অস্বস্তি হচ্ছে। যতই উঠছি অস্বস্তি ততই বাড়ছে। তবুও জীবনে প্রথমবার বরফচূড়ায় পৌঁছানোর লোভে আমরা সবাই এতটাই উন্মুখ ছিলাম যে, এই কষ্টটুকু স্বীকার করতে রাজি ছিলাম। অবশেষে চূড়াতে উঠে এলো আমাদের জীপ। চারদিকে বরফ আর তুষারের রাজ্য, অবর্ণনীয় সৌন্দর্য। দু'টি চূড়ার মধ্যবর্তী ভ্যালিতে স্কেটিং-এর বিশাল আয়োজন। ইতিমধ্যে আমাদের আগেই অনেক ট্যুরিস্ট সেখানে পৌঁছে গেছে। অনেকেই স্কেটিং করছে আবার অনেকে বরফের উপরে চলা বিশেষ গাড়িতে মোটর স্কেটিং-এ ব্যস্ত। ৯০ ডিগ্রি ঢালু পাড় মাড়িয়ে নেমে এলাম ভ্যালিতে। শুরু হলো একে একে স্কেটিং করা। ছোটরাই প্রথমে ইনস্ট্রাকটরের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী শুরু করলো। নিজের পালা যখন আসলো তখন বুঝলাম সঠিক প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন ছাড়া আইস স্কেটিং করা মোটেও সহজ নয়।

সকালে কারও ব্রেকফাস্ট হয়নি। ফলে একদিকে গ্লুকোজ ও অন্যদিকে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাবে ঘণ্টাখানেকের ভেতরই সবাই কাহিল হয়ে পড়লাম। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই অভিযানের ইতি টেনে গাড়িতে উঠলাম সবাই ফিরবার উদ্দেশ্যে। গাড়ি চলা শুরু হতে না হতেই বাধলো বিপত্তি - সামনে বিশাল যানজট। সংকীর্ণ পাহাড়ি রাস্তায় একটু এদিক ওদিক হলেই যানজট সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা জ্যামে আটকে আমাদের অনেকেরই প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত। পথের পাশে বরফের উপরই কাঠ ও চট বিছিয়ে কচি ভুট্টা বিক্রি করছিল কয়েকজন। তাদের কাছ থেকে সবার জন্য ভুট্টা কিনলাম। আগুনে আধ ঝলসানো লেবু মিশ্রিত সেই ভুট্টাকেই তখন অমৃত মনে হলো। যানজট ছুটতেই ফিরতি পথে চলতে শুরু করলো আমাদের গাড়ি। পথে দু'জায়গায় গাড়ি দাঁড় করালাম প্যারাগ্লাইডিং ও হেলিকপ্টার রাইডিং দেখার জন্যে। প্যারাগ্লাইডিং-এ দুই আসনের একটিতে আরোহী ট্যুরিস্ট ও অন্যটিতে ইনস্ট্রাকটর, প্যারাসুট মেলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পর্বত চূড়া থেকে হাজার ফুট নিচে। ধীরে ধীরে অনেকটা চিলের মতো ভেসে ভেসে মর্ত্যে নেমে আসা। অদ্ভুত মাউন্টেন বাইকিং করতে দেখলাম শ্বেতাঙ্গ কিছু পর্যটককে - ডাবল প্যাডেল সাইকেল দিয়ে খাড়া পাহাড়ে ওঠার প্রাণান্তকর চেষ্টা!

মানালি শহরে যখন নেমে এলাম তখন বিকেল প্রায় শেষ। রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করলাম। তারপর ম্যলের উদ্দেশ্যে বেরোলাম। যেতে যেতে বিনোদ

জানালো এখানকার রেড ওয়াইন নাকি বিখ্যাত। তাকে বললাম লিকার শপে নিয়ে যেতে। চেখে দেখলাম, সুদৃশ্য বোতলে ভরা হালকা লাল রঙের পানীয়টি সত্যিই সুস্বাদু। নেমে আসা সেই শীতল-ধূসর সন্ধ্যাকে দারুণ উপভোগ্য করে তুলল। এর মধ্যেই নোমান জানালো আজ তার ছোট মেয়ে আরিনার জন্মদিন এবং এখানেই তা উদ্যাপন করার প্ল্যান আছে। হোটেলে ফিরে নোমান আবার বেরুল ফারহানা ভাবীকে সাথে করে; উদ্দেশ্য শপিং, বার্থডে সরঞ্জাম ইত্যাদি কেনাকাটা। আমি গেলাম হোটেলের খোলা লবিতে। কিছুক্ষণ আগে পান করা ওয়াইনের আমেজ শারীরিক ক্লান্তি দূর করে মেজাজকে ফুরফুরে করে দিয়েছে। ধীরে ধীরে রাত নামছে। উত্তর পশ্চিমে বাতাস বইছে মন্থর। সেই সঙ্গে নামছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। শেষে শীতের কামড় থেকে বাঁচতে রুমে ফিরতে বাধ্য হলাম। বিশাল কাঁচে ঘেরা জানলার পর্দা সরাতেই আবছা আলোয় সামনের পাহাড়টিকে দেখলাম। নিশ্চুপ নিঃস্তব্ধ পরিবেশ। চাঁদ দেখা না গেলেও আকাশটাকে বড্ড প্রাণবন্ত লাগছে, মিটমিট করছে লক্ষ কোটি নক্ষত্র! নির্ভেজাল এই প্রকৃতিতে নিজেকে হারালাম কিছুক্ষণের জন্যে। রাত নয়টার দিকে নোমানরা ফিরলে হোটেলের ডাইনিং -এ ডিনারে গেলাম। প্রথমে কেক কেটে, বেলুন ফুটিয়ে আরিনার জন্মদিন উদযাপন করা হলো। ইসাবা আর কান্তম-ই মজা করলো বেশি। পরে নোমানের সৌজন্যে স্পেশাল ডিনার।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল উত্তর হিমাচলের আরেকটি জেলা ধর্মশালা। মানালি থেকে দূরত্ব প্রায় ২৫০ কি.মি.। পাহাড়ি পথ, প্রায় ৮/৯ ঘণ্টার জার্নি। পাইন ও দেবদারুর সবুজে ঘেরা এই শৈলশহরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে হিমালয়ের তুষার আবৃত সুউচ্চ শৃঙ্গ ধৌলাধার। জানা যায়, পাঞ্জাবের তৎকালীন ডেপুটি গভর্নর ডেভিড ম্যাকলয়েড ১৮৪৮ সালে এই শহরের পত্তন করেন। ম্যাকলয়েড সাহেবের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপন কেন্দ্র হিসেবেই এই শহরের নামকরণ হয় ম্যাকলয়েড গঞ্জ। ১৯০৫ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে পরিত্যক্ত হয় এই নগরী। পরে চীন কর্তৃক তিব্বত অধিগৃহীত হওয়ার পর ১৯৫৮ সালে চতুর্দশ দালাই লামা তেনজিন গিয়াৎসো তাঁর কিছু অনুগামীসহ গোপনে দেশত্যাগ করে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দালাই লামার অনুসারী গাংচেন কিশ্যাং, যোগীবাবা, গমরু, হিরু, ভাগসু, ধরমকোট ও নাদি সম্প্রদায়ের লোকজন ক্রমশ ভিড় করতে থাকে এখানে। ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে এই শহর। বর্তমানে দুই থেকে তিন হাজার তিব্বতী উদ্বাস্তু ও সমান সংখ্যক তিব্বতী ভিক্ষুর বাস এখানে। দুটি ভাগে বিভক্ত এই শহরের উপরের অংশকে আপার ধর্মশালা এবং নিচের অংশকে লোয়ার ধর্মশালা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক পর্যটক ধর্মশালায় ভিড় করে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যে। অনেকে দালাই লামার সাথে সাক্ষাৎ, বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্কৃতি-কৃষ্টি ও শিক্ষা লাভের আশায় এখানে আসেন। এখানে বেশ কয়েকটা আধ্যাত্মিক যোগ-কেন্দ্রও আছে।

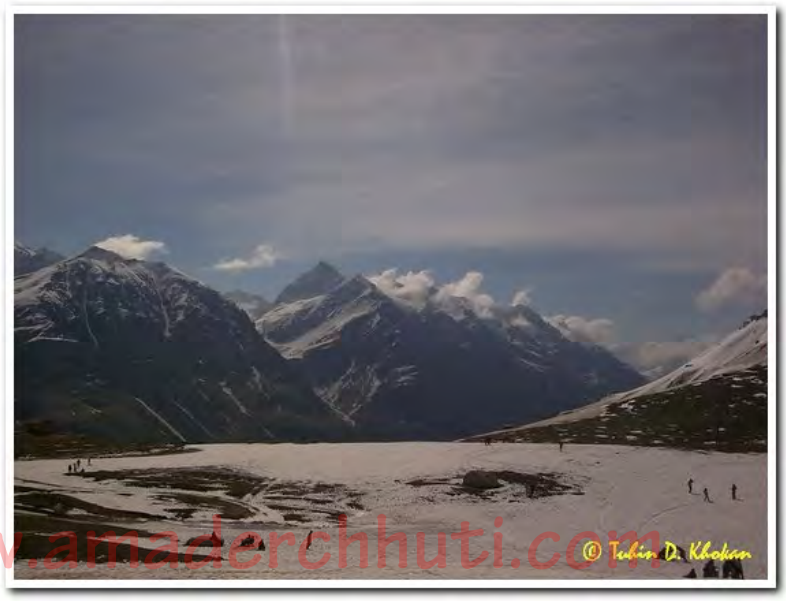

মানালি থেকে মান্ডি হয়ে যখন আপার ধর্মশালায় পৌঁছলাম তখন রাত দশটা। পথে ঝাটিং গ্রি, যোগীন্দ্রনগর, পালামপুর নামক বিভিন্ন পাহাড়ি জনপদ ও শহর অতিক্রম করলাম। অতি সংকীর্ণ, খাড়া ও প্যাঁচানো সড়কপথটি যেখানে শেষ হলো তার অদূরেই আমাদের জন্যে বুকিং করে রাখা হোটেল। দীর্ঘ জার্নির ধকলে সকলেই বেশ ক্লান্ত। কিন্তু হোটেলে ঢুকেই ঘর দেখে বিরক্ত হলাম। খানিক বাদানুবাদের পর হোটেল বদলিয়ে দিতে বাধ্য হলো এজেন্ট। মিনিট তিনেকের দূরত্বের যে হোটেলটিতে আমরা উঠলাম তা মোটামুটি চলনসই।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙলে হঠাৎ মনে হলো সময় যেন স্থির হয়ে আছে। বিছানায় শোয়া আমি, শুধু পায়ের ওপরে যে জানালাটা চোখে পড়ছে, সেখানে একটুকরো চারকোণা আকাশ দেখতে পেলাম, ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটছে সেখানে। টুম্পাকে না জাগিয়ে নিঃশব্দে হোটেলের বারান্দায় এলাম। রাতের অন্ধকারে খেয়ালই করিনি কোথায় এসে উঠেছি। কিন্তু এখন যা দেখলাম তাতে গতরাতের সব তিক্ততা ঘুচে গেল। গাঢ় সবুজ পাইনবন তার ঠিক ওপরে বরফ আবৃত এক বিশাল পর্বত দাঁড়িয়ে আছে যেন আমার জন্যে। অভূতপূর্ব এই অনুভূতির কোন ব্যাখ্যা নেই আমার কাছে। ধীরে ধীরে আলো ফুটছে আর উত্তুঙ্গ ধৌলাধার পর্বত শৃঙ্গ ক্রমশ রক্তিম থেকে সোনালি বর্ণ ধারণ করছে। প্রাকৃতিক এই নৈসর্গতায় নিজেকে খুব সাদামাটা ও তুচ্ছ মনে হলো। মনে মনে পাহাড়ি গভীর অরণ্যের মাঝে গড়ে তোলা এই রিসর্টের স্থপতির প্রশংসা না করে পারলাম না। এতক্ষণ টের না পেলেও প্রচণ্ড শীতের এক ঝলক হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। রুমে ঢুকে জ্যাকেট চড়িয়ে বেরিয়ে এলাম হোটেল ছেড়ে। দুর্লভ এই প্রকৃতিকে একটু কাছ থেকে অনুভব করতে চাই! রিসর্টের সামনের পায়ে চলা পথটিই ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে শহরের দিকে। তার ঠিক উল্টো দিকের পথটি ধরলাম। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসা একটি ক্ষীণ স্রোত ঠিক নালার মতো আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করেছে পথটিকে। পারাপারের জন্যে সুদৃশ্য এক কালভার্টও রয়েছে। ঘন পাইনবন ক্রমশ খাড়া পাহাড়ের গায়ে মিশেছে এমনভাবে যে মাটির অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সূর্য উঠে এলো শৃঙ্গের মাথায়। আরও প্রায় মাইলখানেক হেঁটেও সুস্পষ্ট কোন ট্র্যাক না পেয়ে ফিরতি পথ ধরলাম। এই যাওয়া আসার পথে বেশ কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ যুবক-যুবতী ও তিব্বতী-ভিক্ষুর দেখা পেলাম।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে সবাইকে নিয়ে শহরে নেমে এলাম। সংকীর্ণ পরিসরে ছোটখাট একটি বিপনি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে সিকি মাইল আয়তনের জায়গার মধ্যেই। অনেকগুলো দোকানপাট এরই মধ্যে খুলে গেছে আর তা দেখে ফারহানা ভাবি ও টুম্পা আনন্দে আটখানা। কতক্ষণ এই দোকানে, কতক্ষণ ওই দোকানে ছোটাছুটি করছে। বিপণির এক পাশে পথের ওপর এক স্থানীয় মহিলাকে দেখলাম ট্যুরিস্টদের গায়ে উল্কি আঁকতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম বিভিন্ন প্রকার উল্কির ধরণ ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি। দু'ঘণ্টার মাথায় বিনোদ এসে জানালো ডালহৌসির উদ্দেশ্যে আমাদের এখনই রওনা দিতে হবে নতুবা পৌঁছতে পৌঁছতে গতকালের মতো রাত হয়ে যাবে। ধর্মশালা যখন ছাড়ছি তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য মিনি সুইজারল্যান্ড হিসেবে খ্যাত ডালহৌসির খাজিয়ার। ধর্মশালা থেকে বাই পাস রোড ধরে শাহপুর, সেখান থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে নূরপুর। ছোট ছোট জনপদ লাহরু, টুনুহাটি দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে আয়তনে সংকীর্ণ ও পৃথক পাহাড়ি সড়ক ধরে ডালহৌসি পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা তিনটে।

সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে নয় হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ডালহৌসি পাঁচটি শৈলশিখর নিয়ে গঠিত। চতুর্দিকে তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আক্ষরিক অর্থে স্থানটিকে ভূস্বর্গে পরিণত করেছে। শহরের চারদিকে নয়নাভিরাম সবুজ, তার মাঝে স্কটিশ ও ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যে নির্মিত বাংলো আর গীর্জা স্থানটিকে দিয়েছে মার্জিত লাবণ্য। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহরটিতে ওঠার পথে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দেখা মিললো। কিছুদূর এগোতেই নজরে এলো ভারতীয় সেনানিবাস। অনেকগুলো প্রাচীন মন্দিরের চূড়াও দৃষ্টিগোচর হলো যাদের গন্তব্য পথ কঠিনতম পাহাড়ি ঢালে নির্মিত। তীক্ষ্ণ বাঁকগুলো সত্যিই দুর্গম।

ডালহৌসি প্রাচীন চাম্বা পার্বত্য রাজ্যের (বর্তমান হিমাচল প্রদেশের জেলা) প্রবেশ পথ। খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এক সুপ্রাচীন রাজ বংশের শাসনাধীন এই রাজ্য হিন্দু সংস্কৃতি, শিল্পকলা, মন্দির ও হস্তশিল্পের জন্যে বিখ্যাত। চাম্বা এই সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থল। এই রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ভারসৌর গদ্দি ও গুজর উপজাতির বাসভূমি। বেশিরভাগ মন্দিরই খ্রীষ্টিয় সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সরাসরি খাজিয়ারে গিয়ে পরে ডালহৌসিতে ফিরে কোনো হোটেলে থাকা। কিন্তু খাজিয়াদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের এতটাই বিমোহিত করলো যে এখানে থাকাই মনস্থ করলাম। হোটেল ভাড়া বেশ চড়া এখানে, তাই শিবমন্দির কর্তৃক পরিচালিত অপেক্ষাকৃত একটি কম ভাড়ার হোটেলে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হলো। পাইন ও ফারের সমারোহ তিন দিকের পাহাড়ে, অন্যদিকে চাম্বা ভ্যালির নীচু উপত্যকা। হোটেলের সামনেই পিচঢালা একমাত্র রাস্তাটি সেতুবন্ধন রচনা করেছে অন্যান্য জেলার সাথে।

স্নান শেষে সবাই ফ্রেশ হয়ে মন্দির দর্শনে বেরুলাম। হোটেলের ঠিক পেছনেই মন্দিরের খোলা চাতালে ত্রিশূলধারী ব্রোঞ্জের শিবমূর্তিটি দেখে একাধারে চমৎকৃত ও বিস্মিত হলাম সবাই। প্রায় এগারতলা সমান উচ্চতার মূর্তিটির নির্মাণশৈলী এত নিখুঁত ও চমৎকার যে এর সঠিক শৈল্পিক মান অনুধাবন করা কঠিন। এরপর রওনা হলাম খাজিয়ারের মূল আকর্ষণ গ্রিন ফিল্ডে। সেখানে আরেক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। চারপাশে ঘন সারিবদ্ধ ফারগাছের মাঝে নয়নাভিরাম সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত সুবিশাল ময়দান। আয়তনে যা চারটি ফুটবল স্টেডিয়ামের সমান। মুহূর্তেই মনে হলো সত্যিই বুঝি সুইজারল্যাণ্ডের মাঠ এটি! জায়গাটি মূলত মালভূমিই। মাঠের একপাশে বাচ্চাদের বিভিন্ন খেলার আয়োজনসহ দু'তিনটি রেস্তোরাঁ চোখে পড়লো। কান্তমকে কোল থেকে নামাতে অতি পরিচিত জায়গার মতোই খোলা মাঠে দৌড়তে শুরু করলো। প্রান্তরের বিশালতা যেন খুদে এই শিশুর মনকেও আনন্দে বিহ্বল

www.amaderchhuti.com

করে তুলেছে। সে ছুটছে তো ছুটছেই। খানিকপর তার সাথে যোগ দিল আরিনা ও ইসাবা। বাচ্চাদের এই প্রাণোজ্জ্বল উচ্ছলতা মনকে প্রসন্ন করে তুললো। বৃত্তাকার মাঠের মাঝখানটি ঈষৎ ঢালু, সেখানে বৃষ্টির পানি জমে অস্থায়ী এক ঝিলের সৃষ্টি হয়েছে। ঝিলের উপর স্কটিশ কায়দায় নির্মিত কাঠের ছাউনি ঘেরা মাচায় দর্শনার্থীদের বসবার ব্যবস্থা। পড়ন্ত বিকেলে মিষ্টি রোদ্দুর, খানিকটা শীত-শীত আমেজ, থেকে থেকে দেওয়া ফুরফুরে হাওয়া এসব কিছুই প্রশান্তিতে ভরে তুলছে আমাদের মনকে। গত পাঁচদিনের ক্রমাগত সড়কপথের জার্নিতে বিপর্যস্ত আমাদের এটুকু যেন অবশ্য প্রাপ্য ছিল। জুতো খুলে মাঠের সেই মনোরম সবুজ ঘাসে হাঁটলাম কিছুক্ষণ। অনেকটা যেন জীবনানন্দ...। তারপর সেই নরম ঘাসের উপরই বসে সূর্যাস্তের প্রতীক্ষায় থাকলাম। রক্তিম আভায় দিগন্ত ভাসিয়ে দিয়ে সূর্য পাটে গেলে সবাই মিলে নিকটস্থ রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলাম। টোস্ট ও চা সহকারে বৈকালিক নাস্তা সারলাম। তারপর গাড়ি থাকা সত্ত্বেও অদ্ভুত সেই সন্ধ্যার আলোয় পায়ে হেঁটে হোটেলের পথ ধরলাম।
রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নোমান, আমি, টুম্পা ও ফরহানা ভাবী চারজনে মিলে মন্দিরের চাতালে গিয়ে বসলাম কিছুক্ষণের জন্যে। হোটেলের বৈদ্যুতিক আলোয় প্রতিফলিত হয়ে চারপাশের অন্ধকার অরণ্যকে বড্ড রহস্যময় মনে হলো। লিকার শপ থেকে কিনে আনা ঠাণ্ডা বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে গল্প হলো অনেকক্ষণ।
মাঝরাতে প্রচন্ড দুলুনিতে হঠাৎ জেগে উঠলাম। মনে হলো যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। খাট, ড্রেসিং টেবল, ঘরসহ পুরো হোটেল দুলছে এপাশ-ওপাশ। বাতাসের শোঁ-শোঁ প্রবল গর্জন, সেই সাথে অন্ধকারকে সম্পূর্ণ চিরে ফেলা মুহুর্মুহু বিজলির তীব্র আলো। মনে হলো কেয়ামত বুঝি আসন্ন! ভয়ে আমার স্ত্রী ও কন্যা আমাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। অন্ধকার সেই রুমে আমরা অতি অসহায় তিনটি প্রাণী। বাইরে টর্নেডো তার দোর্দণ্ড দাপটে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে চারপাশ। ৯১'-এর ঘূর্ণিঝড়ের কথা মনে পড়লো আমার। ঝড়ের শুরুতেই বৈদ্যুতিক খুঁটিসহ লাইন উড়ে গেছে আগেই, তাই বিদ্যুৎহীন পুরো হোটেলটাই অন্ধকার পুরীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এক পর্যায়ে ঝড় এমনই রূপ নিলো যে ভাবলাম হায়! ঘরে বুঝি আর ফেরা হলো না, ভ্রমণ পথের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে জীবন যাত্রাও বুঝি ফুরিয়ে গেল এই বিদেশ বিভুঁইয়ে। ঈশ্বরকে স্মরণ করতে করতে একসময় ভোরের আলো ফুটলো। এর মধ্যে ঝড় তার তাণ্ডব থামিয়েছে। রুমের দরজা খুলতেই প্রবল ঠাণ্ডা ধাক্কা মারলো - বাইরে যেন হিম-যুগ। দ্রুত মাঙ্কি ক্যাপ ও জ্যাকেট চাপিয়ে বাইরে এলাম। বেরিয়ে দেখি বড় বড় পাইনগাছ মূল শুদ্ধ উপড়ে পড়ে আছে সামনের রাস্তা জুড়ে। ছেঁড়াপাতা ও গাছের ডাল অবিন্যস্ত চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। গত সন্ধ্যা থেকেই মন্দিরে বাৎসরিক উৎসবের আয়োজন চলছিল। আয়োজকেরা সেই ভোরবেলাতেই খুঁজতে বেরিয়ে গেল ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া লোহার হাঁড়ি-কড়াই। কয়েকটির সন্ধান পাওয়া গেল যেগুলো ততক্ষণে পাহাড়ের গভীর খাদে নিমজ্জিত।
ব্রেকফাস্ট সেরে নতুন জায়গা দেখতে বেরুলাম। কথা ছিল ভিয়ার হিলে যাবো। কিন্তু সময় ও দূরত্ব বিবেচনা করে তা বাতিল করলাম। পরিবর্তে খাজিয়ারের অন্যান্য দ্রষ্টব্য দেখতে বেরুলাম। ছোট থালা আকৃতির ছবির মতো সুন্দর এই পাহাড়ি শহর বিশ্বের ১৬০টি দ্রষ্টব্যের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। ঘন পাইন ও দেবদারুর সবুজ চারদিকে পিচ ঢালা কালো রাস্তার দু'পাশে ট্যুরিজম কর্তৃপক্ষ কাঠের ঝোলানো টবে অর্কিডের চাষ করেছে। পশ্চিমা পর্যটকদের ভাষায় এর সৌন্দর্য "Panoramic & Breathtaking "। সুইস রাষ্ট্রদূত ১৯৯২ সালের ৭ই জুলাই খাজিয়ারকে অফিসিয়ালি মিনি সুইজারল্যান্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেন। সুদূর সুইজারল্যাণ্ড থেকে একখণ্ড পাথর এখানে এনে মূর্তি গড়া হয়েছিল। খাজিয়ারের অদূরেই আরেকটি অপেক্ষাকৃত সমতল চূড়া কালাটপ। বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য হিসেবে খ্যাত এই জায়গায় সহজেই হরিণ, ভাল্লুক, চাইকি অনেক সময় হিমালয়ান চিতারও দেখা মেলে।
দুপুর বারোটা নাগাদ হোটেলে ফিরে স্নান সেরে সবাই তৈরি হলাম। একটার মধ্যে লাঞ্চ সারলাম। আধঘন্টা বিশ্রাম শেষে পৌনে দু'টো নাগাদ গাড়িতে উঠে রওনা হলাম। উদ্দেশ্য পাঞ্জাবের পাঠানকোট রেল স্টেশন। সেখান থেকে রাত দশটায় দিল্লিগামী ট্রেন ধরে নয়াদিল্লি। আমাদের অরণ্যবাস মোটামুটি শেষ। শরতের এই দুপুর যেন সবার মনের মধ্যে একটা ঘোর ঘোর ভাব সৃষ্টি করেছে। ভুতুড়ে নিশব্দতায় দেবদারু ও পাইনবন। সবারই মন খারাপ।
শুরু হলো ফেরা। পাহাড় থেকে পাহাড় হয়ে ক্রমশ নেমে চলেছি সমতলের উদ্দেশ্যে। খাজিয়ার থেকে লাহরু হয়ে নুরপুর। সেখান থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে চাক্কি, তারপর পাঠানকোট শহর। পাঠানকোট মূলত ভারতীয় সেনানিবাস ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সকাল সাড়ে সাতটায় পুরানো দিল্লি স্টেশনে পৌঁছলাম। রাতে দূরন্ত এক্সপ্রেস। পরদিন বেলা দেড়টায় কলকাতায় ঢুকলো ট্রেন। শেয়ালদা স্টেশনে বেরিয়েই দেখি বৃষ্টি। বৃষ্টি! বৃষ্টির বল্লমের শরশয্যায় কলকাতা। এরই মধ্যে কয়েক জায়গায় পানি জমে গেছে। প্রবল বৃষ্টিতে যেন ভেঙে চুরে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে কলকাতা। একটু বাদেই শুনলাম পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আজ পুরো পশ্চিমবঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে বন্ধ ডেকেছে সিটু। একে তো বৃষ্টি তার উপর পরিবহন ধর্মঘট। এ যেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। বৃষ্টি একটু থেমে এলে হাজার হাজার মানুষ বেরিয়ে এলো স্টেশন চত্বর ছেড়ে। অথচ সরকারি-বেসরকারি বাস, অটো রিক্সা, যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি সব বন্ধ। উদ্বেগ ও দুঃশ্চিন্তায় মাথা খারাপের অবস্থা হলো। সাদা রঙের কয়েকটি প্রাইভেট অ্যাম্বাসাডরকে দেখলাম সুযোগ সন্ধানীর মতো তিন চার কিলোমিটারের ভাড়া হাঁকছে পাঁচশো থেকে সাতশো রুপি। আমাদের এই জায়গায় দাঁড় করিয়ে নোমান গেল গাড়ির খোঁজ করতে।
চারদিকে টিভি সাংবাদিক ও পত্রিকা অফিসের ফটোজার্নালিস্টদের ভিড়। ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদেরও ফটাফট কয়েকটি ছবি তুলে নিয়ে গেল তাদের কয়েকজন। দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অনেকটা দেবদূতের ভঙ্গিতে নোমান উপস্থিত হয়ে বললো, গাড়ি একখানা পাওয়া গেছে। শুনে ভীষণ খুশি সবাই। লাগেজ ধরে টানা হেঁচড়া করতে করতে নোমানের পিছন পিছন গিয়ে দেখি তিন-চাকার মাল টানা একখানা রিক্সা ভ্যান দাঁড়িয়ে। নোমানকে জিজ্ঞেস করলাম গাড়ি কই। সে হাত তুলে ভ্যান গাড়িটিকেই নির্দেশ করে বললো আজকে এটাই আমাদের মার্সিডিস কার। অগত্যা মাল পত্তর সব তুলে তার ওপরেই সবাই বাবু সেজে বসলাম। গন্তব্য মারকিউস স্ট্রিটের সেই হোটেল ওরিয়েন্টাল।
পরদিন দুপুর বারোটায় সোহাগ পরিবহনে রওনা হয়ে একদিন পর বাংলাদেশ পৌঁছলাম।

~ হিমাচল প্রদেশের তথ্য ~ হিমাচল প্রদেশের আরো ছবি ~

মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানীতে কর্মরত তুহিনের বেড়ানোর নেশা ছোটবেলা থেকেই। বড় হয়ে সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে ফটোগ্রাফিও। বই পড়া ও গান শোনার পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখিও করছেন বেশ কয়েকবছর ধরেই।

www.amaderchhuti.com

আকাশ আমায় ভরল আলোয়

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

~ কুম্ভমেলার আরো ছবি ~

'আপনিতো অনেকদিন ধরেই কুম্ভে যাচ্ছেন, কখনও বড় কোন মহাত্মার দর্শন পেয়েছেন কি? অলৌকিক কোন ঘটনা ঘটতে দেখেছেন?' - প্রশ্নটা করেছিলাম ভাস্কর মহারাজকে।

এলাহাবাদে মহাকুম্ভে যাওয়ার পরিকল্পনা মাথায় আসতেই থাকবার ব্যবস্থার জন্য বর্ধমানের ছোটনীলপুরের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রমে হাজির হয়েছি। ভাস্কর মহারাজই কুম্ভমেলার সময় প্রয়াগে আশ্রমের দায়িত্বে থাকেন। পড়ে গিয়ে চোট পাওয়ায় মহারাজ তখন ছোটনীলপুরের আশ্রমেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। দেখা করার উদ্দেশ্য জেনে মহারাজ আশ্বস্ত করলেন যে আমাদের জন্য জায়গা রাখা থাকবে, তবে কত জন যাচ্ছি বা কত তারিখে পৌঁছাব এইসব সংবাদ যেন লিখিতভাবে ওনাকে দু'এক দিনের মধ্যে জানিয়ে দিই। প্রয়াগের কুম্ভমেলা সম্পর্কে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য ওনার কাছ থেকে জেনে নিচ্ছিলাম। শুনছিলাম নানান গল্পও। মহারাজ বলছিলেন এই সময়ে অনেক সাধক চলে আসেন স্নান করতে, কিন্তু সাধারণ মানুষের ভীড়ে তাঁদের আর কেউ আলাদা করে চিনে নিতে পারেন না। সেই প্রসঙ্গেই প্রশ্নটা হঠাৎ করে মাথায় এল।

উত্তরটা শুনে কিন্তু একটু নড়েচড়েই বসলাম। মহারাজ বললেন, একবার কুম্ভের সময় হরিদ্বারের হর কি পউরি ঘাটে সন্ধ্যার সময় বসে আছেন। আশে পাশে লোকজন কেউ নেই। অন্ধকার হয়ে আসছে। এমন সময় একজন সাধু এসে বসলেন। তারপর হঠাৎই মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই অ্যাতোদিন যা করেছিস হঠাৎ সেটা ছেড়ে দিলি কেন? ভাল কাজই তো করছিলি।' মহারাজ সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলেন এই সাধু ওনাকে কী ইঙ্গিত করছেন।সাধুটি তাঁকে দু'এক দিন পর একটি বিশেষ দিনে একইসময়ে একই জায়গায় আসতে বললেন। মহারাজ নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে ঘাটে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই দেখলেন সেই সাধুটি এসে হাজির হয়েছেন, হাতে করে এনেছেন একটি সেতার। মহারাজকে উনি বললেন, 'নে, এটা বাজা।' মহারাজ দীর্ঘদিন সেতার বাজাননি। তবে সেতার হাতে নিয়ে কেমন যেন মনে হল, আত্মস্থ হয়ে গেলেন। উনি বাজাতে শুরু করলেন। তবে কী যে বাজালেন বা কতক্ষণই বাজালেন সেটা ওনার আর কিছুই মনে নেই। সময়টা কেটেছিল একটা ঘোরের মধ্যে। বাজানো শেষ হলে সাধুটি সেতার নিয়ে যেমন এসেছিলেন তেমনই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মহারাজের কাছ থেকে ফেরার পথে বারেবারে মনে হচ্ছিল যদি কুম্ভে গিয়ে এমন কোন মহাত্মার দেখা পাই, আবার এও মনে হল কোন মহাত্মা আমাকেই বা দেখা দেবেন কেন, আমার কীইবা যোগ্যতা আছে? কুম্ভের দিকে মনটাতো টানছিলই, এই কাহিনি মনে একটা অন্য আকর্ষণ রচনা করল যেন। কুম্ভ যাওয়ার সবরকম প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। ইন্টারনেট, বই আর পরিচিত মানুষজনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ যার একটা বড় ধাপ। ভদ্রেশ্বরের 'ভ্রমণ আড্ডা'-র আসরেও অনেক প্রয়োজনীয় কথা জানতে পারলাম। হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক এবং উজ্জয়িনী এই চারজায়গায় কুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বারো বছর অন্তর পূর্ণকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়। আর তার মাঝে প্রতি তিন বছরে অর্দ্ধকুম্ভ। সেই অর্থে হরিদ্বার এবং এলাহাবাদে (প্রয়াগে) কুম্ভ স্নান যোগ ঘটে ছ'বছর অন্তর।

www.amaderchhuti.com

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

৭ ফেব্রুয়ারি শিপ্রা এক্সপ্রেসের টিকিট কাটলাম। বিধি বাম, আর.এ.সি.-ও জুটলনা, ওয়েটিং লিস্টে আমাদের নাম জ্বলজ্বল করছে। ১০ তারিখ শাহী স্নান। মহারাজ আমাদের আগেই বলে দিয়েছিলেন যে ঐ দিন থাকতে গেলে আমরা যেন দুদিন আগেই পৌঁছাই। আমাকে নিয়ে দলে মোট ন'জন। এরমধ্যে চারজন আমার অপরিচিত। পরিচিত বাকী চারজন হল - অমিয়দা, প্রভাসদা, অমিত আর বাপী। অমিয়দা অর্থাৎ শ্রী অমিয় নিমাই চৌধুরী বর্ধমান রাজকলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বছর কয়েক হল চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তবে উনিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণ। যেমন চেহারায় তেমনই কাজকর্মে। ওনার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও সহপাঠী প্রভাসদা (প্রভাসকৃষ্ণ সিনহা), কলেজ ছাড়ার পরই ওষুধের কোম্পানিতে চাকরি করতে শুরু করেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল ওষুধ সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য। যে কোন ওষুধের ঠিকুজি কোষ্ঠী গড়গড় করে বলে দেন। তার সঙ্গে রয়েছে অসাধারণ হিউমার বোধ। শ্রীমান অমিত (অমিত ঘোষ), কয়েকটা বছর ওষুধ কোম্পানিতে চাকরির সুবাদে চট করে মানুষকে বুঝে নিতে পারে আর তিনটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, তাই সে আমাদের অফিসিয়াল মুখপত্র। চাকরি একঘেয়ে লাগছিল বলে শ্রীমান বাপীর (রণজিৎ ঘোষ) সঙ্গে ব্যবসা করতে শুরু করেছে। তবে এই চারজনের একটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বা কমন ইন্টারেস্ট আছে, তা হল প্রত্যেকেই ক্যামেরা হাতে পাগল অর্থাৎ ফটোগ্রাফার। ক্যামেরা, তার বিভিন্ন মডেল, টেলি বা জুম লেন্স, স্টিল বা মুভি - সব বিষয়েই এরা সকলেই পণ্ডিত। ক্যামেরা হাতে ঘুরে বেড়াতে এদের কারোর কখনও বিরাগ নেই। আর আমার কাজ হল এদের পিছন পিছন ছোটা।

অমিত আর বাপী শাহী স্নানের সময়টা কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইছে না। মহারাজের কাছ থেকে জেনেছে ঐ দিন নাগা সন্ন্যাসীরা স্নান করবেন। কুম্ভের পরিবেশে এরকম ফটো তোলবার সুযোগ কি আর কেউ হাতছাড়া করতে চায়? নাগা সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আমারও যে কৌতুহল নেই তা অবশ্য নয়। অতএব শুভস্য শীঘ্রম...

যাত্রা শুরুর দুদিন আগে অমিয়দা জানতে পারলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শিবির শাস্ত্রী ব্রিজের কাছে হয়েছে। তাই আমাদের ট্রেন যদি প্রয়াগ ঘাট রেল স্টেশনে থামে তাহলে খুবই সুবিধা হবে। কিন্তু ট্রেনের টাইমটেবিল ঘেঁটে দেখলাম ওরকম কোন স্টেশনে শিপ্রা এক্সপ্রেস থামে না। এই কথা অমিয়দাকে বলতেই উনি স্তোক বাক্য দিলেন, 'কুম্ভ মেলার সময় নিশ্চয় ট্রেন ওই স্টেশনে থামবে।' মনে মনে ভাবলাম, সেটা হলে তো ভালই হয়, আর ট্রেন যদি সোজা এলাহাবাদ চলে যায়...। আসলে এলাহাবাদ স্টেশন থেকে ৭-৮ কিমি পূর্বে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল। ফলে স্টেশন থেকে আমরা কীভাবে সঙ্গমস্থলে পৌঁছাব সেই সম্বন্ধে কোন ধারণাই কারোর ছিল না। আশা করা হচ্ছিল অটো রিক্সা বা বাস, কিছু না কিছু একটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আবার আশঙ্কা হচ্ছিল, যেখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক হাজির হবেন সেক্ষেত্রে যানবাহনের অপ্রতুলতাই স্বাভাবিক। টিভির চ্যানেলগুলিতো বলছে সেদিন আট কোটি লোক হবে!

মুঘলসরাই আসার আগে পর্যন্ত ট্রেন নিজের ছন্দেই ছুটে চলল। মুঘলসরাই আসতেই কুম্ভের প্রকৃত রূপটা খানিক আঁচ পেতে শুরু করলাম - শয়ে শয়ে লোক আমাদের কামরায় উঠে পড়ল। কার্যত আমরা প্রায় বন্দী হয়েই গেলাম। অবস্থাটা এমন দাঁড়াল যে সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাত্যহিক কর্ম্ম করার জন্য বাথরুমে যাবারও উপায় রইল না। এখানে অমিতের জ্বালাময়ী ভাষণও কোন কাজে লাগল না। চারদিকে শুধু মানুষ মাথায় বা কাঁধে মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে

রয়েছে। স্থানীয় দেহাতী মানুষ। তাদের কথাবার্তায় কামরা অল্পক্ষণেই সরগরম হয়ে উঠল। দু'এক জন বৃদ্ধা নীচের বাঙ্কে বা মাটিতে বসে পড়লেও বাকীরা কিন্তু আমাদের জায়গা দখলের কোন চেষ্টাই করেনি। বরং কয়েক ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়েই রইল। বেশ আশ্চর্য হলাম। এলাহাবাদ পৌঁছাতে আরও কয়েক ঘন্টা লাগবে। মুঘলসরাইয়ের পর থেকেই ট্রেনটা লেট করতে শুরু করে দিয়েছে। আপাতত ওপরের বাঙ্কে উঠে ধ্যানস্থ হবার ভান করা ছাড়া সময় কাটাবার আমার অন্য কোন রাস্তা থাকল না। শেষপর্যন্ত প্রয়াগ ঘাট স্টেশনে না থেমে বেশ অনেকটা লেট করে ট্রেন এলাহাবাদে ঢুকল।

এলাহাবাদ স্টেশনে নেমে দেখি শুধুই মানুষ, স্রোতের মত বয়ে চলেছে। আমিও সেই স্রোতে ভেসে চললাম। দলের লোকজনেরা কে কোথায় সেটা বোঝার কোন সুযোগই পেলাম না। জনস্রোতে ভাসতে ভাসতে এক নম্বর প্লাটফর্মে পৌঁছে একধারে দাঁড়িয়ে চারপাশে চেয়ে আপনজনদের খোঁজ করতে লাগলাম। অবশেষে কয়েকজনকে দেখতে পেয়ে একটু স্বস্তি হল। ট্রেন দেরী করে পৌঁছনোয় স্টেশনচত্বর থেকেই একেবারে দুপুরের খাবার খেয়ে বেরোব ঠিক হল। একনম্বর প্লাটফর্মেই একটি রেস্তোঁরায় খাওয়া সেরে বেরিয়ে দুটো অটোরিক্সা যোগাড় করতে বাপী আর অমিতের কালঘাম ছুটে গেল। শেষপর্যন্ত যাওবা পাওয়া গেল সাত কিলোমিটার রাস্তার জন্য ভাড়া চাইছে ৭০০ টাকা! অনেক বাদানুবাদের পর ৪০০ টাকায় রফা হল। কিন্তু অটোরিক্সা আমাদের নামিয়ে দিল যেখানটায় সেখান থেকে সেবাশ্রম সংঘের শিবির আরও অন্তত দেড় কিলোমিটার দূরে। ব্যাগপত্র পিঠে নিয়ে হাঁটা শুরু হল। পুলিশকে জিজ্ঞাসা করে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম গন্তব্যের দিকে। মাঝে আধ কিলোমিটার মত একটা ভ্যানরিক্সায় মালপত্র তুলে দিয়ে একটু আরাম পেয়েছিলাম। পুলিশ এসে রিক্সার রাস্তা আটকানোয় আবার মালপত্র পিঠে নিয়ে এগিয়ে চললাম। এই চলার যেন শেষ নেই। সব বয়সী সব ধরণের মানুষই রাস্তায় নেমেছেন। তবে মাঝে মাঝে মোটরগাড়ি যে যাচ্ছে না তা নয়, এদের নিশ্চয় মেলাপ্রাঙ্গণে ঢোকার বিশেষ অনুমতি রয়েছে। শিবিরের কাছাকাছি পৌঁছে অন্য দলটির সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল, ওরা আমাদের একটু আগেই পৌঁছেছে।

সংঘের শিবিরটি বেশ সুবিধাজনক জায়গায়, শাস্ত্রী ব্রিজের কাছেই। শিবিরে ঢোকার মুখেই বড় গেট। গেটের বাঁ পাশে মাটির মূর্তি - কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শুরুতে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। গেট দিয়ে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেই সামনে মন্দির। বাঁ পাশে অস্থায়ী অফিস আর পিছনের দিকে থাকবার জন্য সারি সারি তাঁবু। অফিসটাকে দুটি অংশে ভাগ করে একাংশে দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়েছে। অন্যদিকে নাম নথিভূক্তকরণসহ অন্যান্য সেবামূলক কাজ চলছে। চত্বরে প্রবেশ করে মালপত্র রেখে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অমিত অফিসে গিয়ে কথা বলে থাকবার কী ব্যবস্থা হয়েছে সেটা জেনে এল। অফিসে ভাস্কর মহারাজ একটা চেয়ারে বসেছিলেন, পাশে একটি লাঠি। বুঝলাম উনি এখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি।

প্রাঙ্গণের মাঝখানে অনেকগুলি তাঁবু খাটানো রয়েছে। এগুলিতে অন্যদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবীদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক ধারে রান্না এবং খাওয়ার ব্যবস্থা। পিছনের দিকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত বরাবর ত্রিপল আচ্ছাদিত। আর চট দিয়ে পাশগুলি ঢেকে অনেকগুলি ঘর করা হয়েছে। এই ঘরগুলোর পাশাপাশি দুটিতে আমাদের আশ্রয় জুটেছে। চারপাশ ঢেকে ফেলার জন্য দিনের বেলাতেও যথেষ্ট আলোর অভাব বোধ হচ্ছে। ঘরগুলির এক কোণলে তার থেকে একটা পি.এল. বালব ঝুলছে - সন্ধ্যেবেলায় আলো জ্বলবে, তবে মেয়াদ রাত এগারোটা পর্যন্ত - স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশ্ন করে এই তথ্য জানা গেল। তাঁবুর পাশে দুদিকেই সারি সারি কল, পলিথিন ঘেরা পায়খানা-বাথরুম। সুন্দর ব্যবস্থা, মাথার ওপর উন্মুক্ত আকাশ, এগজস্ট ফ্যানের দরকার নেই।

প্রয়াগে তাঁবুর সারি

তাঁবুর মধ্যে নিজেদের খুপরিতে ঢুকে মালপত্র একপাশে রেখে মাঝখানে বসা হল। মাটিতে পাতলা করে খড় বিছানো, তার ওপর তোষক পাতা। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিয়ে বেলা পড়ে এলে সকলে মিলে বেরোলাম। রাস্তার ধারে স্থানীয় মানুষেরা মাটির উনুন আর ঘুঁটে বিক্রি করছে। গ্রাম থেকে আসা লোকজন সেই উনুন আর ঘুঁটে কিনে রাস্তার ধারেই সুবিধামত জায়গায় রাতের খাবার বানাতে বসেছে। মেলা প্রাঙ্গণে কোন খাবারের দোকান নেই, তবে রাস্তার ধারে মালা, চুড়ি, টিপ, সিঁদুর, সঙ্গমের জল নিয়ে যাওয়ার জন্য পলিথিনের পাত্র এসব বিক্রি হচ্ছে। শাহী স্নানের এখনও দুদিন বাকী, তাই রাস্তায় হাঁটা যাচ্ছে। গ্রাম থেকে দলবেঁধে যে সব মানুষেরা এসেছেন তাঁরা একে অপরের কাপড় বা লম্বা একটি দড়ি কয়েকজনে মিলে ধরে আছেন। এরা একসঙ্গে থাকতে চাইছে বলে এই জাতীয় দলের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই ধাক্কা লেগে যাচ্ছে। আসলে কোনকারণে দলছুট হলে জনারণ্যে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে এরা দলবদ্ধ অবস্থায় থাকতে চায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এইসব মানুষদের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার সবই আলাদা, অথচ উদ্দেশ্য একটাই। ভারতবর্ষের এই রূপটা যত দেখছি ততই যেন আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

www.amaderchhuti.com

সঙ্গমস্থলের নদীর চড়ায় সমান্তরালভাবে লম্বালম্বি এবং আড়াআড়ি বেশ কয়েকটা রাস্তা সমস্ত অঞ্চলটিকে কয়েকটা জোনে ভাগ করে দিয়েছে। রাস্তার যে অংশ একটু নীচু সেখানে লোহার চওড়া পাত রাখা হয়েছে, নীচ থেকে জল ওঠা বন্ধ করার জন্য এই ব্যবস্থা। রাস্তায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধুসন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষ যাতে সহজেই সঙ্গমে স্নান করতে যেতে পারে তারজন্য রাস্তার পাশে বেড়া দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের জন্য অস্থায়ী প্রস্রাবখানা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে ব্লিচিং পাউডার ছেটানো হলেও তার ধারেকাছে যায় কার সাধ্য। দোষ আমাদেরই, আমরাই সঠিকভাবে ব্যবহার করিনা, অপরের কথা একেবারেই ভাবিনা।

রঙিন মিছিল

চওড়া রাস্তার দুপাশে সাধুদের আখড়া, সর্বক্ষণ মাইক চলছে। যে আখড়ার নাম বেশি তার তাঁবুর আকার-আকৃতিও বড়। মাঝে মাঝে মোটর গাড়ি চেপে দর্শনার্থী/ভক্ত সোজা আখড়ার মধ্যে প্রবেশ করছে। আখড়ার মধ্যে কোথাও নামগান হচ্ছে, কোথাও কোন গুরু ভাষণ দিচ্ছেন। বিস্কুটের কোম্পানি কম দামে ছোট ছোট বিস্কুটের প্যাকেট বাজারে ছেড়েছে, কোন ভক্ত পেটি পেটি বিস্কুটের প্যাকেট পথচলতি মানুষের মধ্যে বিলি করছেন। এইসব দেখতে দেখতে একটি আখড়ার গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। রাস্তার ধারে ধারে নাগা সন্ন্যাসীদের তাঁবু - বড়, ছোট, মাঝারি। সেইমত চেলাদের সংখ্যাও বেশি-কম। সব জায়গাতেই ধুনি জ্বলছে, ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে। সাধুবাবাদের অনেকেই বড় গাছের গুঁড়ি জ্বালিয়েছেন। সেটি একটু একটু করে জ্বলছে। বাবা আদুড় গায়ে ছাই মেখে বসে রয়েছেন। মুখে মৃদু হাসি, অভয় মুদ্রা প্রদর্শন করে রয়েছেন, কেউ কেউ ভক্তকে আশীর্বাদ করছেন। তবে দেশি ভক্তদের চেয়ে বিদেশিনী ভক্তদের কদর বেশি। বাবার পায়ে একশ বা পাঁচশ টাকার নোট দিয়ে প্রণাম করতেই তারা অভ্যস্ত। এক চেলা গুরুর পা টিপে দিচ্ছে। একজন সাধুতো একটি হাত সারাক্ষণ ওপরে তুলে রেখেছেন। এটিই তাঁর সাধন পদ্ধতি। একজন নাগা বাবা কোলের ওপর ল্যাপটপ রেখে মনোযোগ সহকারে কিছু দেখছেন। আমাদের দলে সকলেই ছোট-বড় নানাধরণের ক্যামেরা নিয়ে এসেছে - সবাই ক্যামেরা নিয়ে এইসব নানা কাণ্ডকারখানার ছবি তুলতে ব্যস্ত। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ অনেক আখড়ায় সন্ধ্যারতি শুরু হল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরতি দেখলাম। একজায়গায় সন্ন্যাসীরা আরতি করছিলেন নেচে নেচে। সেখানে লোকের ভিড়ও খুব। একটি আখড়ায় রাস্তার পাশে অস্থায়ী মন্দির তৈরি করা হয়েছে। আরতি দেখতে ভুল করে জুতো পায়েই এগিয়ে গেছি খানিকটা, এক সাধুবাবা আমার পিঠে চাপড় মেরে মনে করিয়ে দিলেন, তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এলাম।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা তিনজন অর্থাৎ অমিয়দা, প্রভাসদা আর আমি ঠিক করলাম শাস্ত্রী ব্রিজে উঠে গঙ্গার ওপাড়ে ঝুসিতে চলে যাব। ব্রিজের ওপর থেকে তাহলে গোটা অঞ্চলটা দেখে নেওয়া যাবে। যদিও আমরা শাস্ত্রী ব্রিজের ঠিক নীচেই আছি, কিন্তু ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ অনেক রাস্তায় যানবাহন বন্ধ করে রেখেছে। গতকাল বিকেলে যত লোক দেখেছিলাম আজ সকালে তার থেকেও বেশি মানুষের ভিড়। পুলিশেরও বেশ একটা সাজো সাজো রব। ব্রিজের ওপর উঠে কিছুটা এগিয়েছি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথায় কথায় খবর পেলাম নতুন রাষ্ট্রপতি ফাঁসি রদের আবেদন নাকচ করায় গতকাল রাতেই আফজল গুরুর ফাঁসি হয়ে গেছে, তাই চারিদিকে নিরাপত্তার এত কড়াকড়ি।

কুম্ভ মেলার প্রাঙ্গণের হাজার হাজার তাঁবু, তার বিচিত্র গঠন, নানা বর্ণ, ততোধিক বিচিত্র মানুষ দেখতে দেখতে ব্রিজের ওপর দিয়ে চলেছি আমরা। কোথাও গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত সন্ন্যাসীদের জমায়েত, কোথাও লাইন দিয়ে বসিয়ে সকালের জলখাবার পরিবেশন করা হচ্ছে, বয়স্ক মহিলারা সকালের রোদে পিঠ দিয়ে গল্পে মেতেছেন, কোন মহিলা উনুন ধরিয়েছেন। এইসব টুকরো টুকরো দৃশ্য আজও যেন চোখের সামনে ভাসে। যমুনার ওপর ন'টি অস্থায়ী সেতু তৈরি করা হয়েছে ভাসমান বয়ার সাহায্যে। এগুলির ওপর দিয়ে মানুষ নদী পারাপার করছে। নদী পার হয়ে শাস্ত্রী ব্রিজ থেকে আমরা নেমে পড়লাম, উদ্দেশ্য ফেরার পথে অস্থায়ী সেতু দিয়েই পার হওয়া। যে পথটা ধরলাম সেটা ভারত সেবাশ্রম সংঘের পাশে এসে রাস্তায় মিশেছে। বেশ ক্লান্ত লাগছিল, তাঁবুতে ফিরে আরাম লাগল।

আমাদের দলের নবীন সদস্যেরা স্নানের সময় সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তারা জানিয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে একাধিকবার স্নান করলে কোন দোষ নেই, তাই স্নান যোগের শুরু আর শেষ এই দুই লগ্নেই জলে নামা হবে ঠিক হল। এই বিশেষ যোগে সারা দেশের সাধু-সন্ন্যাসীরা যদি সঙ্গমের জলে ডুব দিতে পারেন, তাহলে আমরাই বা সে পুণ্যের ছিটেফোঁটা থাকে বঞ্চিত হই কেন? তরুণ সঙ্গীরা আমাদের ভরসাও দিয়েছে যে হাত ধরে ধরে স্নানে নিয়ে যাবে। তাহলে আর চিন্তা কী? আমরা তিনজন বয়স্ক আর দুজন অল্পবয়সী জোট বাঁধলাম শাহী স্নানের জন্য।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের তাঁবু থেকে সঙ্গম ক্ষেত্র অনেকটা দূরে, তাই সময়টা আন্দাজ করে বেরিয়ে পড়লাম। লজ্জা নিবারণের বস্ত্র ছাড়া পরিধেয় আর সবই বর্জন করা হল। শুকনো জামাকাপড়, গামছা আর কুম্ভের জল নেওয়ার বোতল সঙ্গে নেওয়া হল। যথাসম্ভব ভিড় এড়িয়ে একসময় সঙ্গমস্থলে পৌঁছালাম। লোকে লোকারণ্য। তারমধ্যে সামান্য একটু জায়গা করে পলিথিন শিট বিছিয়ে জামাকাপড় রাখা হল আর শিটের তলায় পাদুকা। ঠিক হল প্রথমে তিনজন স্নান করে আসবে, তারপর দুজন। আমি দ্বিতীয় দলে স্থান পেলাম। আপাতত তাই কাজ পাহারা দেওয়া। প্রথম দলটি ফিরলে আমরা দুজন এগোলাম। অগুনতি মানুষের মাঝে ফাঁকফোকর দিয়ে স্নানের জায়গায় পৌঁছতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। বিশাল সঙ্গমক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রে স্নান করছেন। নদীর পাড় থেকে সামান্য দূরে অগভীর জলে বাঁশের বেড়া দেওয়া আছে, যাতে স্নানার্থীরা জলে না ভেসে যায়। তাছাড়া বেড়ার ওধারে নৌকাতে অনেক পুলিশ রয়েছে স্নানার্থীদের সাহায্যের জন্য।

অগণিত মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে একসঙ্গে স্নান করছে, এটাই অবাক হয়ে দেখার। কালকূটের মত আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়নি সঙ্গমে এসে। কোন বৃদ্ধ আমাকে অবলম্বন করে স্নান করেনি বা পাঞ্জাবী মহিলাদের অনাবৃত অবস্থায় স্নান আমাকে দেখতে হয়নি। শোনা হয়নি কোন যুবতী বিধবা শিবপিয়ানীর দুঃখের কাহিনি। দেখা হয়নি মুন্ডিতমস্তক খনপিসিকে, কিম্বা চিনতে পারিনি কোন সর্বনাশীকে। দোষটা সম্পূর্ণ আমার। আমার চারপাশে অগুনতি মানুষের ভীড়ে অর্ধশতাব্দী আগে কালকূটের দেখা সব চরিত্র আজও রয়েছে। তাদের চিনতে পারার দায় আমার। সে চোখ থাকলে তবেই চোখে পড়বে। তাই অভিজ্ঞতার ঝুলি আমার হয়তো শূণ্যই রয়ে গেল।

কুম্ভ স্নান

স্নান সেরে বোতলে সঙ্গমের জল নিয়ে উঠে আসার পর দেখি চারদিক একইরকম লাগছে। যেখানে জামাকাপড় রাখা আছে আর অমিয়দা-প্রভাসদা দাঁড়িয়ে আছে সেসব কিচ্ছু চোখে পড়ছেনা। চারপাশে অচেনা মানুষের ভিড়ে স্থান-কাল-পাত্র সব একাকার হয়ে গেছে। সদ্য স্নাত দুজনে একই জায়গায় ঘুরপাক খেতে লাগলাম। মনে মনে ভাবলাম এভাবে আদুড় গায়ে হাফপ্যান্ট পড়েই বোধহয় ফিরতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমার সঙ্গী বাকিদের খুঁজে পেতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

www.amaderchhuti.com

শেষবিকেলে আবার রাস্তায় বেরোলাম। ভারত সেবাশ্রম সংঘের শিবিরের সামনে, রাস্তার পাশে যেখানে যেটুকু জায়গা ছিল সবটাই দেহাতী গ্রাম্য মানুষদের ভিড়ে ভরে উঠেছে। পরিবারের মহিলারা রাতের খাবার তৈরি করছেন, বাকিরা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজবে ব্যস্ত। আশ্রয় বলতে মাটিতে একটি পলিথিন শিট বা খালি বস্তা পাতা হয়েছে। আর গায়ে দেবার জন্য একটি চাদর। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমদিকটায় এলাহাবাদে রাতের দিকে যথেষ্টই ঠান্ডা পড়ে। আমাদের মত শহুরে মানুষদের সঙ্গে রয়েছে কয়েকপ্রস্থ শীতবস্ত্র। তফাত এতোটাই। সঙ্গমে স্নানের জন্যে আসা সারা ভারতবর্ষের অগুনতি মানুষ রাস্তার ওপর কুঁকড়ে শুয়ে রাত কাটায় শুধুমাত্র একটি চাদর গায়ে দিয়ে। আর খাবার বলতে - আগুনে পোড়ানো ময়দার ডেলা। এই সব দেখতে দেখতে পথ চলছিলাম। ভাবছিলাম, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ কত অল্পেই সন্তুষ্ট। কোথাও চোখে পড়েনি কোন মানুষকে বাকবিতন্ডা করতে বা উষ্মা প্রকাশ করতে। অথচ ভারত সেবাশ্রম সংঘের তাঁবুতে আশ্রয় পাওয়া বাঙালি ভদ্রলোকেরা কেউ কেউ রীতিমতো ক্ষুব্ধ আশ্রয় বা খাবারের জন্য। তাঁরা বোধহয় একবারও ভেবে দেখছেননা সর্বত্যাগী এই সন্ন্যাসীরা কী সেবামূলক কাজই না করে চলেছেন সর্ব্বক্ষণ।

পথের ধারে দোকানীরা

রাস্তায় চলতে চলতে কত কিছুই না চোখে পড়ছে। যুবক পুত্র মাকে সঙ্গমে স্নান করাতে নিয়ে এসেছে। ভিড় রাস্তায় আগলে চলেছে মাকে। গ্রাম থেকে দল বেঁধে বয়স্করা এসেছে কুম্ভস্নানে, সঙ্গে দু'একজন কমবয়সী পুরুষ। একে অপরের কাপড়ের খুঁট ধরে রয়েছে যাতে হারিয়ে না যায়। কালকূটের দেখা বিকলাঙ্গ বলরামও রয়েছে, তবে আজ তার আশ্রয় হুইলচেয়ার। রাস্তার পাশে ছোটবড় পুঁতির মালা, হার নিয়ে দেহাতীরা বসে আছে খরিদ্দারের আশায়। এদের মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়ল অল্পবয়সী সুন্দর মুখ - সিঁথিতে হালকা সিঁদুর আর সলজ্জ হাসিতে চোখে পড়ে দাঁতে কালো ছোপ - ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দী করি।

দিনের আলো নিভে গিয়ে চারদিকে বিজলি বাতি জ্বলে উঠে মেলাপ্রাঙ্গণকে মোহময় করে তুলেছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে মেলাপ্রাঙ্গণ থেকে অনেকটা পিছনে চলে এসেছি - উদ্দেশ্য রাতের প্রয়াগ দেখা। উঁচু পাড়, এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। পাওয়াও গেল একটা বেশ জুতসই জায়গা - ছোট একটি মন্দির সংলগ্ন বাড়ির ছাদে উঠে দুচোখ ভরে দেখলাম আলোকিত প্রয়াগ। আলোর মালা দিয়ে যেন সারাটা প্রাঙ্গণ সাজানো। তবে লক্ষ-কোটি লোকের পায়ের ধুলোয় সাদা হয়ে গেছে। ঢেকে দিয়েছে আলোর মালাকেও।

দশই ফেব্রুয়ারি। সকালে তাড়াতাড়িই তৈরি হয়ে বেরোলাম নাগা সন্ন্যাসীদের দর্শন করার জন্য। কাছেই জিলিপি ভাজে, গতকালই সন্ধান পেয়েছি। মনের আনন্দে জিলিপি দিয়ে পেট ভরিয়ে পথে নামলাম। কিছুটা এসে বাধা পড়ল, পুলিশ রাস্তা আটকেছে। সামনের রাস্তা ধরে বিভিন্ন মঠের সন্ন্যাসীরা ফিরছেন শাহী স্নান সেরে। মোটর গাড়ি, লরি সব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। ওপরে সিংহাসনে উজ্জ্বল পোষাকে আর ফুলের মালা গলায় আশ্রমের মহান্ত-মহারাজেরা বসে রাস্তার দুপাশের দর্শনার্থী-ভক্তদের আশীর্বাদ বিতরণ করছেন। হঠাৎ মাইকের আওয়াজে কানে তালা লেগে যাবার যোগাড় হল - তাকিয়ে দেখি সেই উচ্চস্বরের গানের সঙ্গে এক সন্ন্যাসিনী সিংহাসনের ওপর বসে বসেই যেন নাচছেন - হাঁ করে তাকিয়ে দেখার মতই ঘটনা বটে।

মুহূর্তে আবার সচকিত হয়ে উঠি 'হঠ হঠ' শব্দে। জনগণ রাস্তা থেকে পাশে সরে যাচ্ছে। দেখি নাঙ্গা সন্ন্যাসীদের মিছিল আসছে, সামনে কয়েকজন সন্ন্যাসীর হাতে খোলা তরোয়াল - রাস্তা খালি করার জন্য একটু ভয় দেখানোই যার উদ্দেশ্য। স্নান সেরে ফিরছেন - সারা গায়ে ভস্ম মাখা। ভিড় আর ধাক্কাধাক্কিতে

ইতিমধ্যেই দলছুট হয়ে পড়েছি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও অমিত-বাপীর দেখা না পেয়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম স্নানের তোড়জোড় করতে।
গতকাল থেকেই লক্ষ লক্ষ মানুষ স্নান করে চলেছেন। সংবাদ মাধ্যম আগেই সতর্ক করেছিল যে আজ মৌনী অমাবস্যার শাহী স্নানে আট কোটি মানুষ সামিল হবেন। আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না ঠিক কত মানুষ রয়েছেন, তবে কোটি কোটি মানুষ একত্র হলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায় তা নিজের অভিজ্ঞতায় পরখ করতে পারলাম। আজ আর অমিয়দা-প্রভাসদা স্নানে গেলেন না, শুধুই বাপী আর আমি দুজনে। ভিড় এড়াবার জন্য এদিক-ওদিক দিয়ে হাজির হলাম সঙ্গমে। কালকের কথা মাথায় রেখে একটা নম্বর দিয়ে চিহ্নিত লাইট পোষ্টের নীচে সাময়িক আস্তানা করলাম। একজন স্নানে গেলে অন্যজন পাহারায় থাকলাম জুতো-জামাকাপড়ের। আজ আর গতকালের মত নাকানি চোবানি না খেলেও এক-দু মিনিট ঘোরাঘুরি করে পোষ্টের নীচে ফেরত আসতে পারলাম।
ফেরার পথে রাস্তায় অজস্র চটি জুতো পড়ে থাকতে দেখে একটু খটকা লেগেছিল। তখন বুঝতে পারিনি ঘটনাটা কী ঘটেছে। তাঁবুতে ফিরে আসার পর অমিতের সঙ্গে দেখা হলে ও জানালো পদপিষ্ট হয়ে কয়েকজন মানুষ মারা গেছেন। সেদিন আমাদের পক্ষে এরচেয়ে বেশি জানা সম্ভব ছিল না। পরে বাড়ি ফিরে পুরোনো খবরের কাগজের পাতা উলটে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলাম - সকালে স্নান সেরে পুণ্যার্থীরা ফিরছিলেন। কুম্ভের ১২ নং সেক্টরে হঠাৎ ভিড় বেড়ে যাওয়ায় দুজন পদপিষ্ট হয়ে মারা যান। একজন আবার পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। মনে পড়ে গেল প্রায় ছয় দশক আগে কালকুট প্রয়াগ কুম্ভে এসেছিলেন। সেদিনও তাঁকে চাক্ষুষ করতে হয়েছিল এমনই এক মর্মান্তিক ঘটনা। হারিয়ে ছিলেন বলরামকে। এই সঙ্গমে এসেই পরিচিত হয়েছিলেন এক কুলীন ভুঁইহার পরিবারের অশীতিপর বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী শ্যামার সঙ্গে। সেদিন শ্যামাও হারিয়েছিল তার স্বামীকে।
ঘটনার এখানেই শেষ নয়, মৌনী অমাবস্যার পুণ্যস্নান সেরে ফেরার পথে এলাহাবাদ রেলস্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত কুড়ি জন মারা যান। ঘটনাটি ঘটে সন্ধ্যে সাতটার সময়। পরে খবরের কাগজ থেকে জেনেছিলাম ওইসময় মাইকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে ৬ নং প্ল্যাটফর্মে একটি ট্রেন আসছে। এরপরেই ওভারব্রিজে থাকা যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যাওয়ায় তাদের পায়ের চাপে ওভারব্রিজটিই প্লাটফর্মের ওপরে ভেঙ্গে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটে যায়।
সন্ধ্যায় অন্যদিনের মতই এদিনও সকলে মিলে হাঁটতে বেরোলাম। চোখে পড়েছিল অস্থায়ী সেতুর পাশে আশ্রয় নেওয়া বৈষ্ণব পরিবারটি। সন্তানকে সামলাচ্ছেন পিতা। তিনি নিজেই আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। একেবারে ছোট বাচ্চাকে নিয়ে এই ঠান্ডায় খোলা আকাশের নীচে হাসিমুখ বৈষ্ণব পরিবারটিকে দেখে একটু আশ্চর্য হলাম বৈকি। খানিক এগোতেই চোখটা আটকে গেল গেরুয়া রঙে - কয়েকজন সাধু গঞ্জিকা সেবন করছেন। ধূমায়িত কলকের হাত বদল হচ্ছে মাঝে মাঝেই - ধোঁয়ার কুন্ডলী উর্দ্ধে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। একজন সাধুতো কলকেতে এমন টান মারছেন যে দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনে হল দম আটকে না যায়। নদীর ধারে নানান আকার-প্রকারের ক্যামেরা হাতে বিদেশিদের ভিড়। সূর্য্য ডোবার পরই ঠান্ডা পরতে শুরু করে দেয়, আমরা এবার ফেরার পথে ধীরে ধীরে পা বাড়ালাম। মেলাপ্রাঙ্গণের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হল ভিড় অনেকটাই হালকা হয়ে গেছে, অনেকেই ফিরে গেছেন। আমাদের ফেরার টিকিট অবশ্য বেনারস থেকে কাটা হয়েছে। কিন্তু কালকে এখান থেকে বেনারস যাওয়ার কোন যানবাহন আদৌ পাব কীনা সেই চিন্তা করতে করতেই ফিরছিলাম। এই ভিড়ে সবই অপ্রতুল।
পরদিন সকালে একটু তাড়াতাড়িই তৈরি হয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু দলের নবীন সদস্যেরা ক্যামেরা হাতে শেষবারের মত মেলাপ্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়েছিল। অতএব রওনা হতে হতে দুপুর গড়িয়ে গেল। অনেক নাকানি চোবানি খেয়ে শেষপর্যন্ত মধ্যরাতে বেনারস পৌঁছেছিলাম আমরা। কিন্তু সে আর এক কাহিনি।
সেদিন সকালে ভারত সেবাশ্রম সংঘের তাঁবুর কাছে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছি হঠাৎ মধ্যবয়সী এক মহিলা এসে সঙ্গম যাওয়ার পথের হদিস জানতে চাইলেন। আরও দুজন ছিলেন ওনার সঙ্গে। বললেন ভিড়ের চাপে দলছুট হয়ে পড়েছেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তাঁদের দুর্দশার কথা। ধাক্কাধাক্কিতে শাড়ি-জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে, কোনমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। সংকোচ কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সঙ্গে টাকাপয়সা আছে কীনা। আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। ভাবছিলাম এত কষ্টের মধ্যেও সহায়সম্বলহীন অবস্থায় প্রয়াগে স্নানের জন্য ছুটে চলেছেন। প্রয়াগ থেকে বেনারস ফেরার পথেও চোখে পড়ল অজস্র মানুষ নিজের মোট মাথায় বা পিঠে করে হেঁটে চলেছেন। এ যেন এক অনন্ত যাত্রা। আমাদের মত শহুরে মানুষের চিন্তা এদের গ্রাস করে না। প্রয়োজন হয় না মিনারেল ওয়াটার কিম্বা যানবাহনের। চোখের সামনে যেন ভেসে এলো হাজার বছরের পুরোনো ভারতবর্ষ। সেদিন থেকে আজও এই আদি ও অকৃত্রিম ভারতবাসীরা সব কিছু ত্যাগ করে পুণ্য অর্জনের জন্য বেরিয়ে পড়েন কুম্ভ বা কেদারনাথের সন্দর্শনে, অক্লেশে, নির্দ্বিধায়।
এটাই ভারতবর্ষের আসল রূপ।

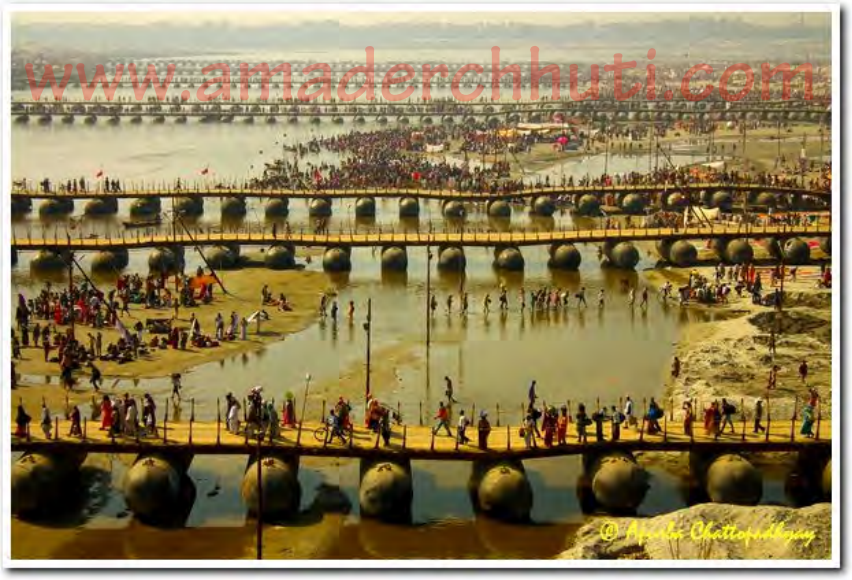

~ কুম্ভমেলার আরো ছবি ~

প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক অপূর্ব-র নেশা বেড়ানো আর ছবি তোলা। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা চোখের আড়ালে চলে যাওয়া টেরাকোটার মন্দিরশিল্পকে ক্যামেরার দৃষ্টিতে পুনরুদ্ধার করাই তাঁর ভালোলাগা। পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ভ্রমণ ও অন্যান্য লেখা।

---

tell a Friend

অপার্থিব

প্রোজ্জ্বল দাস

রূপকুণ্ড ট্রেক রুট ম্যাপ || ট্রেকের আরো ছবি - ১ - ২

দুপুরবেলা যখন হামাগুড়ি দিয়ে কালু-বিণায়ক পৌঁছলাম, তখন শরীরে আর শক্তি বলে কিছু বাকি নেই। প্রবল ঠাণ্ডা, তুমুল বৃষ্টি, প্রচন্ড হাওয়া দিচ্ছে, দুর্ধর্ষ খিদে পেয়েছে, তার ওপর আবার ওই সাংঘাতিক চড়াই। কালু-বিণায়কে খানিক বিশ্রাম নিয়ে ভাগুবাসাতে পৌঁছে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। পাথুরে একটা জায়গা, চারদিকে বরফ পড়ে আছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। চারদিকে খালি কালচে বাদামী আর খয়েরী রঙ। কোথাও কোথাও ধূসর অথবা সাদা রঙের বরফ। কেমন একটা বিষণ্ণ জায়গা। গিয়েই মনে হল জায়গাটা থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।

একটা পাথুরে চাতালের ওপর আমাদের তাঁবু খাটানো হল। চাতালটা এতটাই পাথুরে যে তাঁবুতে যেভাবেই শোওয়ার চেষ্টা করি না কেন, মনে হয় শরীরটা একটা আঁকাবাঁকা লাইন হয়ে গেছে। সন্ধে হতে না হতেই উষ্ণতা হিমাঙ্কের নিচে। তাঁবুর চেন খুললে তাঁবুর মধ্যে মেঘ ঢুকে পড়ে, এরকম অবস্থা। হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও কিচ্ছু দেখা যায়না। তার ওপর উচ্চতার জন্য শুরু হল মাথা যন্ত্রণা। খেতে ইচ্ছে করছেনা, সব মিলিয়ে এক বিশ্রী অবস্থা। কোনমতে অর্ধেক জেগে, অর্ধেক ঘুমিয়ে রাতটা কাটল।

ভোরবেলা উঠে রূপকুণ্ডের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। তখনও সূর্য ওঠেনি। পুব আকাশটা সবে ফরসা হতে শুরু করেছে। পশ্চিম দিকে রাজকীয় ভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ - ভোরের আলোতে আস্তে আস্তে গোলাপী হয়ে উঠছে। চিড়িয়ানাগে পৌঁছে শুরু হল সত্যিকারের ট্রেকিং। সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। পাথুরে রাস্তা ভিজে পিছল হয়ে আছে। পা ফেললেই হড়কে যাচ্ছি, তার ওপর আবার বরফ। গাইডরা বরফের মধ্যে গর্ত করতে করতে চলেছে। সেই গর্তের মধ্যে পা ফেলে চলতে হবে। তার বাইরে পা রাখলে হড়কানোর সম্ভাবনা একদম সেন্ট পারসেন্ট, আর হড়কালে কোথায় গিয়ে যে পড়ব কোন ঠিক নেই। একটু করে যাই, জিভ বের করে হাঁপাই আর ওপরদিকে তাকিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিই, ওই তো, ওই বড় পাথরটার পেছনেই রূপকুণ্ড!

একটা সময় এল যখন রাস্তা বলে আর কিছুই নেই। এমনিতেই পায়ে চলা রাস্তা, বরফ পড়ে তা কোথাও ভেঙ্গে গেছে, কোথাও ঢেকে গেছে। সামনে খাড়াই পাহাড়, কোথাও বরফ, কোথাও আলগা নুড়ি-পাথর। প্রত্যেকবার পা রাখবার সাথে সাথেই একটু একটু করে নুড়ি-পাথর নীচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, এত আলগা। আমরা খানিক হামাগুড়ি দিয়ে হরিনাম জপতে জপতে ওপরে উঠছি। ততক্ষণে আমি বেঁচে ফেরার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। এমন সময় দেখতে পেলাম সামনে বেশ খানিকটা বরফে ঢাকা জায়গা, তারপর জমিটা ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। সেখানটা দেখা যাচ্ছেনা, ঢালু জায়গাটার ওপারে একটা পাহাড় খাড়া দেওয়ালের মত সোজা ওপরের দিকে উঠে গেছে। অনেক উঁচুতে যেখানে পাহাড়টা শেষ হয়েছে, সেখানে ঘন নীল রঙের আকাশে ঝকঝক করছে সূর্য। কি তার তেজ! বরফ ঢাকা জায়গাটার পরে যেখানে জমিটা ঢালু হয়ে গেছে ওইখানেই রূপকুণ্ড।

www.amaderchhuti.com

রূপকুণ্ড থেকে

ওপরে উঠে কেমন একটা হয়ে গেলাম। মনে হল পৃথিবী থেকে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি। সামনে বরফে ঢাকা একটা হ্রদ। হ্রদটার ওপারে সেই খাড়া পাথরের দেওয়াল। উল্টোদিকে, যেদিকে পাহাড়টা ঢালু হয়ে নেমে গেছে, যেদিক থেকে আমরা উঠলাম, সেদিকে আমাদের থেকে অনেক নীচে মেঘের একটা স্তর। আমরা দাঁড়িয়ে আছি পাহাড়টার একটা খাঁজে। মাথার ওপরে ঘন নীল আকাশ। আকাশের এরকম গাঢ় নীল রঙ আমি আগে কখন দেখিনি, খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে যেন চোখ ব্যথা করে! সেই অদ্ভুত নীল রঙের সামনে আশে পাশের পাহাড় গুলোর গাঢ় বাদামী অথবা খয়রি রঙের পাথর আর সাদা রঙের বরফ যে কি অপূর্ব সুন্দর লাগছে তা বলে বোঝানো যায়না। আমরা বাঙালিরা, যারা গাঙ্গেয় সমভূমিতে বড় হয়েছি, আমাদের আশেপাশে যেরকম সৌন্দর্য দেখতে পাই, তা যেন কেমন কোমল, স্নেহ মাখানো। কিন্তু এ একেবারে দুর্ধর্ষ সুন্দর।

রূপকুণ্ড উত্তরাখন্ড রাজ্যে হিমালয়ের ত্রিশুল পাহাড়ের প্রায় কোলে ১৬,৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত একটা গ্লেসিয়াল লেক। ট্রেকিং শুরু হয় লোহাজং নামে একটা চটি জাতীয় জায়গা থেকে। তিনদিনের একটু বেশি লাগে পৌঁছাতে। প্রথম দিন লোহাজং থেকে দিদনা নামে একটা গ্রাম, তারপরের দিন দিদনা থেকে বেদনি বুগিয়াল, তার পরের দিন বেদনি থেকে ভাগুবাসা। বেদনি থেকে ভাগুবাসার পথে প্রথমে আসে ঘোড়ালোটানি, তারপর পাথরনাচুনি, তারপর একটা সাংঘাতিক খাড়াইয়ের পর কালু-বিণায়ক, এবং অবশেষে ভাগুবাসা। পরের দিন আলো ফোটার আগে ভাগুবাসা থেকে বেরিয়ে রূপকুণ্ড দেখে একদম বেদনিতে ফেরত। তার পরের এবং শেষ দিন বেদনি থেকে ওয়ান গ্রাম। সেখানেই শেষ হয় এই ট্রেক। আমরা তিন বন্ধু মিলে এই রূপকুণ্ড ট্রেকে গিয়েছিলাম। আমাদের গাইড ছিল মোহন সিং। মোহন সিং-এর বাড়ি ওয়ান গ্রামে। মোহন সিং পুণের একটা দলকে আমাদের সাথে গাইড করছিল। হিমালয়ের বুকে এটাই তাদের প্রথম ট্রেক।

অনেকক্ষণ পরে যখন বরফ গলতে শুরু করল সূর্যের তাপে, আমরাও নীচে নামা শুরু করলাম। বরফ আর নুড়ি-পাথরের মধ্যে দিয়ে কোনমতে নেমে যখন নীচে ভাগুবাসাতে ফিরে এলাম, তখন একটা অদ্ভুত আনন্দ হল - মনে হল তাহলে বাড়ি ফিরতে পারব! এদিকে সকাল থেকে প্রায় কিছুই পেটে পড়েনি, বেলা এগারোটা বাজে, কিন্তু তখনও কিছু খাবারের নামগন্ধ পাওয়া যাচ্ছেনা। কী ব্যাপার? খোঁজ করে জানা গেল দ্বিতীয় দলটির একটা ছেলের রূপকুণ্ড ওঠার সময় শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। মোহন সিং তাকে রাস্তায় বসিয়ে খাবার, জল দিয়ে ওপরে গেছিল, আর বলে গেছিল সে যেন সেখানেই বসে অপেক্ষা করে। মোহন সিং ফেরার সময় তাকে নিয়ে নিচে নামবে। ফেরার রাস্তায় মোহন সিং তাকে দেখতে পায়নি। তাঁবুতে ফিরে এসেও দেখা গেছে সে নেই। গেল কই? নির্ঘাত রাস্তায় কোথাও বসেছিল। ফেরার তাড়াহুড়োতে কেউ খেয়াল করেনি। মোহন সিং তাই কিচেন টেন্ট-এর ছেলেটাকে নিয়ে আবার গেছে তাকে খুঁজতে। অগত্যা থাকো বসে, যতক্ষণ না তারা ফেরে। এদিকে ভাগুবাসা থেকে বাকি দলগুলো এক এক করে ফিরে যেতে লাগল। প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেল। তাও কেউ ফেরেনা। শেষপর্যন্ত বাকি সবাই ফিরে গেল, জায়গাটাতে শুধু আমরাই পড়ে রইলাম। কী অদ্ভুত চুপচাপ হয়ে গেল ভাগুবাসা। সময় যায়, বসে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই, কখন কেউ আসবে। মাঝে মাঝেই তাঁবুর পরদা সরিয়ে দেখি কেউ আসছে কীনা। যত সময় যায়, মাথায় তত উল্টোপাল্টা চিন্তা এসে জাঁকিয়ে বসে। এরকম করেই কেটে যায় আরো ঘন্টাখানেক। হঠাৎ দেখা যায় কিচেন টেন্ট-এর ছেলেটা দৌড়ে দৌড়ে আসছে। এসে বলে, "বাবুজি, উ ফিসল গয়া। উসকা বডি মিলা হ্যায়। বহুত নীচে। ম্যায় আয়া গোড়া লে জানে কে লিয়ে।"

হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে। কেমন অদ্ভুত একটা ভয় এসে চেপে বসল মনের ওপর। ওদের দলটায় একটা মেয়ে ছিল। হঠাৎ পাশের তাঁবু থেকে মেয়েটি চিৎকার করে কেঁদে উঠল। ভাগুবাসা মনের মধ্যে একটা গা ছমছমে অনুভূতি নিয়ে আসে। জনশূন্য ভাগুবাসাতে বসে একটা মেয়ের চিৎকার করে কান্নার আওয়াজ - মনে পড়লে আজও শিউরে উঠি। আবার শুরু হয় অপেক্ষা। কখন মোহন সিং ফিরবে। কোথাও কোন আওয়াজ হয়, আর আমাদের মনে হয় ওই বুঝি আসছে। এইবার সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখতে হবে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়, ঠায় বসে থাকি, মোহন সিং আর ফেরেনা।

বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ তাঁবুর পর্দা সরিয়ে কিচেন টেন্ট-এর ছেলেটা উঁকি মারে। জানায় ওরা মৃতদেহটা নিয়ে ফিরে এসেছে। আজকের মধ্যেই আমাদের বেদনি ফিরতে হবে। আমাদের কিছু খেয়ে নেবার জন্য ডাকল। ঘড়িতে দেখি বিকেল সাড়ে চারটে বাজে। এখন বেদনি!! ভাগুবাসা থেকে বেদনি পৌছাতে পাঁচ-সাড়ে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে। চট করে স্যাক গুছিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াই। মোহন সিং প্রত্যেককে খাবারের থালা ধরিয়ে দেয়। পাশেই ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে। পিঠে মৃতদেহটা। তাকাতে সাহস হয়না, তবু চোখ চলেই যায়। চারটে হাত-পা কী ভয়ঙ্করভাবে ঝুলছে। মাথার কাছটা একটা চটের বস্তা

দিয়ে ঢাকা, বস্তাটা চুইয়ে রক্ত পড়ছে পাথরের ওপর। ঘোড়াটা নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে মাছি তাড়াচ্ছে। কিছুই খেতে পারিনা। ইতিমধ্যে ওদের দলটা বেরিয়ে পড়েছে। তাদের পেছন পেছন মোহন সিং মৃতদেহ সমেত ঘোড়াটা নিয়ে চলল। তার খানিক পরে আমরা তিনজন। কিচেন টেন্ট-এর লোকেরা রয়ে গেছে, গোছগাছ করে তারপর আসবে।

তিনজনে যখন ভাণ্ডবাসা থেকে হাঁটা শুরু করলাম তখন বাজে সাড়ে পাঁচটা। সাতটায় সূর্যাস্ত হবে। ততক্ষণে আমরা ঠিক কতদূর যেতে পারব এটা হিসেব করতে গিয়ে গলাটা যেন শুকনো শুকনো ঠেকল। হনহনিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। কোথাও একটা আওয়াজ নেই, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আমরা তিনজনে চুপচাপ কোন কথা না বলে যত জোরে যাওয়া যায়, চলেছি। মাঝে মধ্যেই রাস্তায় পাথরের ওপর পড়ে রয়েছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত!

দুদ্দাড়িয়ে যখন পাথরনাচুনি এসে পৌঁছলাম, তখন বাকি দুটো দলকে পেরিয়ে গেছি, সবার আগে হাঁটছি। আরো জোরে পা চালালাম - দিনের আলো থাকতে থাকতে যতখানি যাওয়া যায়। ঘোড়ালোটানি যখন পৌঁছলাম, ঠিক তক্ষুনি সূর্য ডুবল। ঘড়িতে তখন সন্ধে সাতটা। আমাদের ধারণা হয়েছিল ঘোড়ালোটানি থেকে বেদনি খুব বেশি দূর না। কাজেই দিনের আলো থাকতে থাকতে ঘোড়ালোটানি পৌঁছতে পেরে আমরা ভারি খুশি হলাম। এটা যে কতবড় ভুল ধারণা ছিল, সেটা পরে বুঝতে পেরেছিলাম!

ঘোড়ালোটানি যাওয়ার পথে - পশ্চাৎপটে নন্দাঘুন্টি

কোথাও একটা জনপ্রাণী দেখা যায়না। আমরা তিনজনে মিলে হাঁটছি। দিনের আলো দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বৃষ্টিটাও ক্রমশ বাড়ছে। ঠিক সোয়া সাতটা নাগাদ দিনের সব আলো শেষ হয়ে গেল - ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। আমাদের তিনজনের কাছে একটাই টর্চ। সেটা নিয়ে আস্তে আস্তে এগোচ্ছি তিনজনে। বৃষ্টিটা বাড়তে বাড়তে মুষলধারে এল। বৃষ্টিতে পথের পাথরগুলো পিছল হয়ে গেছে, পা রাখামাত্র হড়কে যাচ্ছে। পায়ে চলা পথ, খুব বেশি হলে তিন ফুট চওড়া, বাঁদিকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে, আর ডানদিকে খাদ। সেই সময় কোথা থেকে এল কুয়াশা। সে এমন কুয়াশা যে টর্চ-এর আলো রাস্তা পর্যন্ত ভালো করে পৌঁছায় না। ঠিক করে বুঝতে পারিনা কোথায় পা রাখছি, পাথরে না মাটিতে। ভিজে চুপ্পুড় হয়ে গেছি। ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে চলেছি। বেদনি যাবার জন্য এই রাস্তা থেকে একটা বাঁক নিতে হয়, কিন্তু এই কুয়াশার মধ্যে সে বাঁক চেনা যে আমাদের কম্ম নয় তা আগেই বুঝেছি। কিন্তু তখন পেছনে ফিরে যাবারও সাহস নেই। একবার ঠিক করলাম দাঁড়িয়ে পড়ি, মোহন সিং এলে তারপর যাওয়া যাবে। কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়াবার পরও কেউ আসেনা। এদিকে ঠান্ডায়, বৃষ্টিতে, ভিজে জামাকাপড় পরে আমাদের জমে যাওয়ার অবস্থা। হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে। তখন আমরা আবার চলাই ঠিক করলাম। ততক্ষণে আমরা বুঝতে পারছি, আমাদের পরিণামও ওই ছেলেটার মতই হতে চলেছে। এমন সময় পেছন থেকে যেন একটা আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। তিনজনেই থমকে দাঁড়ালাম। আবার! কুয়াশার মধ্যে দিয়ে মনে হয় যেন বহু দূরে কেউ কোথাও একটা আলো নাড়াচ্ছে!

বেদিনি বুগিয়াল

আমরা প্রবল জোরে চিৎকার শুরু করি। টর্চের আলোটা নাড়তে থাকি। উত্তরে ওদিকেও আওয়াজটা খানিক বাড়ে। খানিক পরে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে একটা অবয়ব আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে - ছাতা মাথায় একটা লোক। এসে বললে, "মোহন সিং নে মুঝে ভেজা।" তারপর সমস্ত কিছু কেমন অস্পষ্ট হয়ে আসে। খালি মনে পড়ে আমার আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে একটা লম্বামতন লোক, গায়ে একটা জোব্বা, একহাতে মাথায় ছাতা ধরে আছে। কুয়াশায় তাকে স্পষ্ট দেখা যায় না। বৃষ্টির মধ্যে টর্চের আলোয় তাকে কেমন নীলচে একটা মূর্তির মত দেখায়। সে তার দেশের নানান গল্প করতে করতে আমার আগে আগে চলেছে আর আমি কেমন মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকে অনুসরণ করছি। কখন যেন বাকি দলদুটোও পেছনে এসে হাজির হয়। এখনও মনে আছে, হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। যেই একটু আস্তে হচ্ছি, ঘোড়াটা কাঁধের কাছে এসে নিঃশ্বাস ফেলছে। অমনি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করছি। খানিক পরে আবার যে কে সেই। এভাবে কতক্ষণ হেঁটেছিলাম মনে নেই। যখন বেদনি পৌঁছলাম, তখন ঘড়িতে সাড়ে আটটা।

www.amaderchhuti.com

ঠিক হয়েছিল আমরা বেদনিতে থেকে যাব। আর অন্য দলটা সেই রাতেই ওয়ান গ্রামে ফিরে যাবে। তাঁবু তখনও এসে পৌঁছায়নি, তাই আমাদের জন্য একটা ট্রেকার্স হাট খুলে দিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা। একটা কাঠের ঘর, ভেতরে ফায়ার প্লেসের মতন একটা জায়গায় আগুন জ্বালা হল। আমরা তিনজনে ভেতরে ঢুকে বেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম - এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম! স্যাক ঘেঁটে সব থেকে শুকনো যে জামা-কাপড় গুলো পাওয়া গেল, সেগুলোও আদ্দেক ভেজা। আমাদের টেন্ট, স্লিপিং ব্যাগ কিছুই এসে পৌঁছায়নি। তাই সেই আধ-ভিজে জামাকাপড় পরে বসে বসে কাঁপছি। ঘরে আগুন জ্বলছে, কিন্তু তাও যেন ঠান্ডা যায়না। এমন সময় অন্য দলটাও এসে ঢুকল ওই ট্রেকার্স হাটে। কী ব্যাপার! জানা গেল, আমরা সবাই এলেও মোহন সিং তখনো এসে পৌঁছায়নি। ফরেস্ট অফিসার জানিয়েছে মোহন সিং না আসা পর্যন্ত সে বাকিদের যেতে দিতে পারবেনা। সবাই মিলে ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন মোহন সিং আসবে, কখন স্লিপিং ব্যাগগুলো এসে পৌঁছাবে, এই ঠান্ডায় আর পারা যাচ্ছেনা। অন্ধকার কাঠের ঘরটা কেমন স্যাঁতস্যাঁতে আর চুপচাপ। শুধু মাঝে মাঝে মেয়েটার ফোঁপানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। থেকে থেকে আগুনটা নিবু-নিবু হয়ে আসছে। তখন কেউ একটা উঠে গিয়ে খানিকটা কেরোসিন ঢেলে দিচ্ছে, আগুনটা আবার দপ করে জ্বলে উঠছে। সারা ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে উঠছে, চোখ জ্বালা করছে। দরজার বাইরেটায় শোয়ানো হয়েছে ছেলেটাকে। সবাই ঠান্ডায় জড়সড় হয়ে বসে বসে ঢুলছে। ফরেস্ট অফিসার আমাদের এক এক করে জেরা করছে কী হয়েছিল, আর তারপর গম্ভীর মুখ করে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করতে করতে তার খাতাতে কীসব জানি লিখে রাখছে। এদিকে মোহন সিং আর ফেরেনা!

বেগতিক দেখে ফরেস্ট অফিসার একদল লোককে পাঠাল মোহন সিংকে খোঁজার জন্য। ঘন্টাখানেকের মধ্যে সেই দলটি ওপরে পাথরনাচুনিতে পৌঁছে ফোন করে জানাল যে পথে কোথাও তারা মোহন সিংকে দেখতে পায়নি। এদিকে পাথরনাচুনিতে একজন জানিয়েছে যে সে মোহন সিংকে নীচে যেতে দেখেছে ঘন্টা তিনেক আগে। তাহলে সে গেল কোথায়? ফরেস্ট অফিসার গম্ভীর মুখ করে মাথা নেড়ে স্বগতোক্তি করে, "লাগতা হ্যায়, মোহন সিং ভি গয়া। ইয়ে বারিষ নে সব গরবর কর দিয়া...". আমাদের বোধশক্তিটাও যেন লোপ পায়। এ ওর গায়ে হেলান দিয়ে কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে থাকি। আগুনটা আবার আস্তে হয়ে আসে...।

মোহন সিং বিস্ত - আমাদের গাইড

বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনা। হঠাৎ দড়াম করে ট্রেকার্স হাট-এর দরজাটা খুলে গেল। একঝলক বরফ ঠান্ডা হাওয়া ঘরটায় ঢুকে পড়ল। হাওয়া পেয়ে আগুনটাও আবার দপ করে জ্বলে উঠলো। ধড়মড় করে উঠে বসি আমরা সবাই। আধো আলো আধো অন্ধকারে স্বপ্নের মত দেখা যায় একটা লোক, আগাগোড়া বর্ষাতিতে মোড়া, ঘরের মধ্যে ঢুকে আসে, মাথার টুপিটা খুলে ফেলে - মোহন সিং। ঘুমভাঙ্গা চোখে ওই আলো আঁধারিতে যেন মসীহার মত দেখতে লেগেছিল সেদিন মোহন সিংকে।

অন্য দলটা তাড়াতাড়ি আসার জন্য ওদের স্যাকগুলো ওপরে ভাণ্ডবাসাতে ফেলে এসেছিল। কথা হয়েছিল ঘোড়াগুলো ওগুলো বয়ে আনবে। কিন্তু একটা ঘোড়া কমে যাওয়ায় এতগুলো স্যাক ঘোড়ার পিঠে চাপানো সম্ভব হয়নি। ঘোড়াওয়ালা তাই নীচে নেমে এসে মাঝরাস্তায় মোহন সিংকে ধরে একথা জানায়। মোহন সিং তখন

রূপকুণ্ডে

আবার ফিরে যায় ভাণ্ডবাসাতে। তারপর স্যাকগুলোকে কাঁধে চাপিয়ে বাকি ঘোড়া, টেন্ট, স্লিপিং ব্যাগ সমস্ত নিয়ে এই মাঝরাতে বেদনি পৌঁছেছে। সব কিছু শোনার পর সন্দেহ হয় এ কি সত্যি মানুষ?
বাকি রাতটা সেদিন ওরকমভাবে বসে বসেই কেটেছিল কারণ আমাদের স্লিপিং ব্যাগগুলো আনার সময় বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল। সকাল ছ'টার সময় উঠে মোহন সিং আমাদের ম্যাগি আর চা বানিয়ে খাওয়াল। আগের দিন খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা হবার জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইল। আমরা আশ্চর্য হয়ে বুঝতে পারলাম না ঠিক কী বলা উচিৎ। আবার শুরু হল হাঁটা, এবার দিনের আলোয়, নিশ্চিন্ত মনে। ঘন্টা দুয়েক উৎরাই ভাঙ্গার পর যখন আমরা নীলগঙ্গা নদীর পুলটাতে পৌঁছলাম তখন সকালের উজ্জ্বল রোদ ঝাঁপিয়ে পড়েছে নদীপারের একচিলতে ঘাসে ছাওয়া জমিতে। ঘন সবুজ ঘাসের ওপর সাদা, হলুদ নানা রঙের ফুলগুলো দুলছে। চারদিকে পাখি ডাকছে, কতকগুলো মেয়ে শুকনো পাতা কুড়িয়ে গ্রামে ফিরছে।
জীবন কী আশ্চর্য রকম সুন্দর!

চৌখাম্বা

রূপকুণ্ড ট্রেক রুট ম্যাপ || ট্রেকের আরো ছবি - ১ - ২

প্রোজ্জ্বলের জবানিতে - গড়পড়তা ল্যাদখোর ভেতো বাঙালি। আড্ডাবাজ। রবিবারের সকালের জলখাবারে লুচি আর বিরিয়ানিতে পাঁঠা ছাড়া জীবনটা কেমন খাঁ খাঁ করে। কলকাতা প্রেমিক। শরতের সকালে আর শীতের দুপুরে আপিসে বসে কাজ করতে করতে মনে হয় পর্যটক হলে বেশ হত!

www.amaderchhuti.com

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ছেড়ে চেনা রুট

ঝুমা মুখার্জি

সুন্দরডুঙ্গা ট্রেক রুট ম্যাপ || ট্রেকের আরো ছবি

হঠাৎ করেই ঠিক করলাম পিণ্ডারি-কাফনি ট্রেক করে আসব। পনেরো দিনের একটা লম্বা ব্রেক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কলকাতা ছাড়ার চোদ্দ ঘন্টা পর কাঠগোদাম স্টেশনে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা ভুলিয়ে দিল যে এটা মে মাস। কাঠগোদাম স্টেশনটা ছোট কিন্তু ছিমছাম সাজানো মনটা বেশ ভালো করে দেয়। সকাল ছ'টা বাজে - শহরটা জাগেনি এখনও ভালো করে।

নিজেদের স্যাক জিপের মাথায় চাপিয়ে ড্রাইভারের পাশে জায়গা করে নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে স্থানীয় মানুষে বাকি সিটগুলো ভরে গেল। শুকনো খাবার সঙ্গে যা ছিল খেতে খেতে চললাম । ধীরে ধীরে রোদের তাপ আর গরম বাড়তে লাগল। কিন্ত পাহাড়ি পথের সৌন্দর্য সব কষ্ট দূর করে দিল। কুমায়ুনী মানুষদের গল্পে আমরাও যোগ দিলাম। ভীমতাল পেরিয়ে কিছুটা যাবার পর বিনসরের রাস্তা আলাদা হয়ে গেল। এ পথ ভীষণই সুন্দর, প্রকৃতি নিজে হাতে এমনভাবে সাজিয়েছে যে বারে বারে আসতে মন চায়। বাগেশ্বর পৌঁছলাম দুপুর দেড়্টায়। এখানেই সাক্ষাৎ হল নন্দন ভাইয়ার সঙ্গে। পুরো নাম নন্দন দানু, এ পথে আমাদের গাইড। কুড়ি ঘন্টার মধ্যে কলকাতা থেকে বাগেশ্বর এসে আমরা ভীষণ ক্লান্ত,এক ঘন্টার ব্রেক নিয়ে জিপে উঠলাম। রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। সং-এ গাড়িবদল হল। আগে এখান থেকেই ট্রেক শুরু হত। কিন্তু এখন গাড়ি লোহারক্ষেত অব্দি চলে যাচ্ছে। তাই লোহারখেত থেকেই কাল হাঁটা শুরু হবে। বাগেশ্বর থেকে লোহারখেতের কে.এম.ভি.এন. বাংলোয় আসতে আসতে সন্ধে হয়ে গেল। চা খেতে বসে ট্রেক প্ল্যান নিয়ে আলোচনা হল।

খাতি গ্রাম

www.amaderchhuti.com

পরদিন সকালে চা পানের পর চটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম দিন উৎসাহ একটু বেশিই। আমরা যাব ঢাকুরি। ৯ কিমি পথ। প্রথম ৭ কিমি প্রায় পুরোটাই চড়াই। তারপর ঢাকুরি টপ থেকে কে.এম.ভি.এন. বাংলো আরো ২ কিমি উতরাইয়ে। সকাল থেকেই খুব রোদ আর গরম। জঙ্গলের মধ্যে পথ, কখনও রোদ, কখনওবা ছায়া ছায়া পথে হাঁটা। যেতে যেতে প্রচুর রডোড্রেনডন গাছ চোখে পড়ল তবে তেমন ফুল নেই। মাত্র একমাস আগে ফুলে ভরা ছিল এইজায়গাই। এক ঘন্টা পর প্রচণ্ড খিদে পেল, কিন্তু আশেপাশে কোন চায়ের দোকান নেই তাই আমরা আরও ১ কিমি হেঁটে লোয়ার ঢাকুরিতে এলাম, সেখানে চায়ের দোকানে বসে ম্যাগি-অমলেট-চা পেট ভরে খেলাম। আমরা খাওয়া-দাওয়া পর্ব শেষ করে উঠবো এমন সময় চারজন বাঙালি যুবক এসে বসল। এরা সুন্দরডুঙ্গা থেকে ফিরছে। শুনেছি রুটটা বেশ কঠিন। কিন্তু এর বেশি তথ্য আমাদের কাছে ছিল না। গত তিন-চার মাস ধরে বই ও ইন্টারনেট ঘেঁটে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছি,সেই সূত্রে সুন্দরডুঙ্গার সঙ্গে সামান্য পরিচিতি। ওদের সঙ্গে মিনিট দশ-পনের কথা বলার পর আমার সঙ্গী মত পরিবর্তন করল। মানে পিণ্ডারি নয় আমরা যাব সুন্দরডুঙ্গা। আমাদের গাইড প্রথমে একটু আপত্তি জানালেও শেষে রাজি হয়ে গেল। সে পথে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে জানি না, তবে এটা বুঝলাম বেশ বড় চ্যালেঞ্জ। আবার নতুন করে আমাদের প্ল্যানিং শুরু হল। আলোচনা করতে করতে আমরা ঢাকুরি টপ এসে গেলাম,এখানে একটি বনদেবীর মন্দির আছে, আমরা প্রণাম সেরে নামা শুরু করলাম। এদিকে একটু আগে আমি হঠাৎ খেয়াল করতে বুঝলাম আমার সঙ্গীদের থেকে কোনভাবে আলাদা হয়ে গেছি। আমার আগে পরে কেউ কোথাও নেই। পায়ের কাছে একটা পাকদন্ডি রাস্তা ঘিরে আছে আর মাথার ওপরে সূর্যদেব হাসছেন। কোনদিকে যাব ঠিক করতে পারছি না,আবার এটাও বুঝতে পারছি না যে আমি রাস্তা হারিয়েছি কিনা। এখানে যোগাযোগের কোন উপায়ও নেই তাই ব্যাগ থেকে মোবাইল বার করে আবার রেখে দিলাম। ঢাকুরিতে বি.এস.এন.এল.-এর কানেকশনের সুবিধা পেতে পারি, তার আগে নয়। মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর ওদের দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। তারপর একসঙ্গেই চলা শুরু করলাম। বেলা প্রায় দেড়টা নাগাদ, আমরা ঢাকুরি পৌঁছলাম। ভীষণ সুন্দর জায়গা, ১৮০ ডিগ্রি জুড়ে হিমালয় বিরাজমান। মেঘের আড়াল থেকে নন্দাখাত মুহূর্তের জন্য দৃশ্যমান হল। পাইন-দেওদারের ছাওয়ায় ঘেরা সবুজে ঘাসের ময়দানে আমাদের টেন্ট পাতা হল। তবে এখানে কে.এম.ভি.এন. আর পি.ডব্লুডি.-র বাংলো আছে তাছাড়া ফরেস্ট রেস্ট হাউসও আছে। তবে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সবকটিরই ভগ্নপ্রায় দশা। বিকাল থেকে জমিয়ে ঠাণ্ডা পড়ল। সোয়েটার, টুপি, জ্যাকেট একে একে সব বেরোল। দিল্লিবাসী এক অবাঙালি পরিবারের সঙ্গে আলাপ হল, সন্ধেটা আগুনের পাশে বসে আড্ডা মেরে কেটে গেল। এখানে সূর্যাস্তের পর সোলার বাতি জ্বলে । তাই দিনে-রাতে দুবেলাই সূর্যের আলো। তবে এখানে দিন যেমন তাড়াতাড়ি শুরু হয়, রাত হয় দেরিতে। ঠাণ্ডা ক্রমশ বাড়ছে। রাতে এখানে কিছুই করার নেই,তাই আটটার মধ্যে ডিনার করে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে গেলাম। উচ্চতাজনিত কারণে বা অচেনা পরিবেশে ঘুম সহজে এল না। সূর্য ওঠার আগেই অনিন্দ্য জাগিয়ে দিল। কোন ভিউপয়েন্টে যাবার তাড়া যদিও নেই তবু ভোরের প্রকৃতি দেখার লোভ সামলাতে পারি না। টেন্টের বাইরে এসে দেখি দূরের সাদা পাহাড় যেন আবিরে মাখামাখি। নন্দু ভাইয়াও গরম চা সঙ্গে বিস্কুট নিয়ে হাজির। সাড়ে সাতটায় পরাঠা তরকারি আর চা খেয়ে হাঁটা শুরু করলাম। সেই খাবারের স্বাদ আজও মুখে লেগে আছে। ঢাকুরিতে কেউ ইচ্ছা করলে দু-তিন দিন অনায়াসে নিরিবিলিতে প্রকৃতির মাঝে কাটিয়ে যেতে পারেন, খারাপ লাগবে না।

পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার - খাতি থেকে দেখা

আজকের গন্তব্য ঢাকুরি থেকে রিটাং। কাল প্রথম থেকেই চড়াই চড়তে চড়তে প্রাণান্তকর দশা হয়েছিল,আজ অবশ্য বেশ খানিকটা পথ উতরাইয়ে নামলাম। নন্দুভাইয়া বলল, আজকের রাস্তা বেশ সহজ। ছোট ছোট গ্রাম, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ। ভাগদানু, খরকিয়া গ্রাম পথে পড়ল। বাচ্চার দল এগিয়ে এসে দু'হাত জোর করে নমস্তে বলে হাত বাড়াচ্ছে। দুটো টফি পেয়ে ওরা কী ভীষণ খুশি। যেতে যেতে উমলা প্রাথমিক স্কুল পড়ল,ছুটির পর বাচ্চারা ছুটে ছুটে ঘরে ফিরছে। পরনে ছেঁড়া-ফাটা জামা, মুখে কিন্তু অমলিন হাসি। এদের সঙ্গে আমরাও এগিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ জলের শব্দ কানে এল,নীচে তাকিয়ে দেখি বহমান পিণ্ডারি, এতটা রাস্তা নদী বিহীন - কেমন একটা লাগছিল, এবার সব ক্লান্তি উধাও হল। হাঁটার বেগ বাড়ল। ঘড়িতে দুটো বাজে,পা চালিয়ে দেখি একটু দূরেই পিণ্ডারি ও সুন্দরডুঙ্গা নদীর সঙ্গম। পাহাড়ে আসার এই মজা,পথে অনেক ছোট -বড় নদীর দৃশ্য, সঙ্গম-এর সৌন্দর্য সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। হাইডেল পাওয়ারের কাজ হচ্ছে গ্রামের মানুষই এই কাজে সামিল। নন্দুভাইয়ার বাড়িও এসে গেছে,আমরা যেতেই মহিলা-বাচ্চারা এসে ঘিরে ধরল। চোখে-মুখে তীব্র কৌতুহল। ঘরে তৈরি দইয়ের ছাঁচ এগিয়ে দিল,নিমেষে ক্লান্তি দূর। কয়েক ঘর পরিবার নিয়ে ছোট্ট গ্রাম রিটাং, এখানে বিদ্যুৎ, সোলার পরিষেবা, মোবাইল পরিষেবা কিছুই নেই, খাতি যেতে হয় ফোন করার জন্য। স্কুলও আছে খাতিতেই। বিকালে সঙ্গম দেখতে গিয়ে রামদানার খেত দেখলাম, রামদানার আটার রুটি শীতকালে শরীর গরম রাখে। তারপর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হল। সারারাত চলল। সকালে সবাইকে নিয়ে অনেক ছবি তুলে ফেরার পথে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম।

আজ ৫ কিমি হেঁটে যাব 'জাতোলি গ্রাম'। এর উচ্চতা ৮৫০০ ফুট,এ পথের শেষ গ্রাম। প্রবল বেগে সুন্দরডুঙ্গা বয়ে যাচ্ছে আর সামনে তুষারশুভ্র হিমালয়,অসাধারণ লাগছে। আজ সঙ্গে গাইড ছাড়া চলেছে তিনজন পোর্টার - রেশন, টেন্ট নিয়ে। কাল থেকে কঠিন ট্রেক শুরু হবে। এবার একটু ভয় ভয় লাগছে। কোন ট্রেকার এপথে চোখে পরেনি এখনও। সারা রাস্তা নদী আমাদের সঙ্গে থাকবে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সর্বক্ষণ, ১টা-২টো খুব ছোট গ্রাম পড়ল। কখনও ঝরনা পথ আটকাচ্ছে। ধীরে ধীরে হেঁটেও দুপুর ১২টার সময় জাতোলি পৌঁছে গেলাম। জাতোলি কথার অর্থ যদিও আমার জানা নেই তবে সবুজ গ্রাম নাম দিতে ইচ্ছা করছিল। পথে আসতে আসতে বেশ কটি গ্রাম দেখলাম সেই তুলনায় জাতোলি বেশ বড়। একটি প্রাথমিক স্কুলও আছে। বেশির ভাগ বাড়ি পাকা আর নিজেদের চাষবাসও আছে ফলে সারাবছর খাবারের অভাব হয় না। এই রুটে ট্রেকার খুব কম আসে, তাই থাকার জন্য গ্রামের গাইডদের বাড়িতেই উঠতে হয়। আমরা এখানকার পরিচিত গাইড পুস্কার সিং এর বাড়িতে রাত কাটাব। কাল থেকে আমাদের শুরু হবে অভিযান, জানিনা ভাগ্য ও প্রকৃতি আমাদের সঙ্গে থাকবে কতটা। অনিশ্চয়তা জেনেই এপথে এসেছি, তাই ভেবে কী হবে।

পরদিন সকাল থেকে নন্দুভাইয়ার ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। আমরা ৬ টা নাগাদ চা খেয়ে বেরিয়ে পরলাম, আজকে হাঁটতে হবে দীর্ঘ পথ, তাই প্রথম থেকেই একটু পা চালিয়ে যেতে হবে, তাছাড়া আজ আবাহাওয়া ভাল মনে হচ্ছে না।

সুন্দরডুঙ্গা ভ্যালি, দেবীকুণ্ড প্রবলভাবে টানছে, যেতে তাই হবেই। এতক্ষণ ছোট ছোট গ্রাম, লোকজন, ঘোড়াওলা চোখে পড়ছিল, এবার তাও দেখা যাবে না। এখন থেকে শুধু গাইড ও পোর্টার সহ আমরা দুজন আর আদিম নির্জন প্রকৃতি। তবে কিছু স্থানীয় অল্পবয়সী পাহাড়ি ছেলে যাচ্ছে পিঠে ব্যাগ নিয়ে। এরা অনেক উঁচুতে ঘাসের মত কোন গাছ (স্থানীয় নাম আশা-গন্থ)-র খোঁজে বেরিয়েছে, বিশ্বের বাজারে যার মূল্য অনেক। একজন আমাদের গাছটি চেনাল। লাখ লাখ টাকায় বিদেশে এ জিনিষ রপ্তানি হচ্ছে। হিমালয়ের গহিনে কত কী যে লুকিয়ে আছে যার সন্ধান হয়ত মানুষ আজও পায়নি।

সুন্দরডুঙ্গা ট্রেক

পাহাড়ে যে যার গতিতে এগিয়ে যায়। প্রথম ১-২ কিমি একসঙ্গে যাচ্ছিলাম,তারপর দুর্গম চড়াই অতিক্রম করতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু মনের জোরে ধীর গতিতে এগিয়ে চললাম। অনেকটা খাড়া চড়াই তারপর একটু সমতল আবার চড়াই, আবার কখনও পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ঝরনা পেরিয়ে যেতে গিয়ে পোশাক-জুতো ভিজে গেল, আবার নড়বড়ে কাঠের সেতু পেরোতে গিয়ে রীতিমত হিমসিম খেলাম। তার সঙ্গে চলছে আমার ভিডিওগ্রাফি, তাই মাঝে মাঝেই আমি সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলাম। ঘন জঙ্গলের মধ্যে নিজেকে বড় বেশি বেমানান লাগছিল, মনে হচ্ছে যেন পায়ের শব্দে এখানকার বাসিন্দাদের ঘুম ভাঙবে। চারপাশ এতই নির্জন যে পাখির ডাকেও প্রায় চমকে উঠছি। সকাল থেকে আকাশ মেঘলা ছিল, এবার বৃষ্টি শুরু হল। রেনকোট পরে নিলাম। বৃষ্টির মধ্যে হাঁটার গতি আরও কমে এল। দূরে একটা বাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে দেখে ভাবলাম সেখানে পৌঁছে একটু চা খেয়ে জিরিয়ে নেওয়া যাবে ভাবলাম। গিয়ে দেখি এক মেষপালক সেখানে আশ্রয় নিয়েছে, চা পাওয়া যাবে না। অগত্যা মুখে লঞ্জেন্স রেখে এগিয়ে গেলাম। এই জায়গার নাম দুনিয়া-ঢং। আরও দু' কিমি যাবার পর দেখলাম সামনে কোন রাস্তা নেই। বোল্ডারের পথ আর সুন্দরডুঙ্গা নদী ভীষণ বেগে বয়ে চলেছে। সেইসঙ্গে পাহাড় থেকে ছোট বড় নানা জলধারা নেমে নদীকে আরও ভয়ঙ্কর রূপ করে তুলেছে। সাদা মেঘ দূরের পাহাড়কে ঢেকে দিয়েছে। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলো, তাড়াতাড়ি বড়ো পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিলাম। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে , পরোটা আর আলুর তরকারি বার করে ভাগ করে খাওয়া হল। আধ ঘণ্টা পর বৃষ্টি কমতে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। বোল্ডারের রাস্তা দিয়ে খাড়া চড়াই উঠতে হল। সেখানে পা স্লিপ করে পড়ে গিয়ে বেশ চোট পেল আমার সঙ্গী। এই পথে এসে কতখানি ঝুঁকি যে নিয়েছি তা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু যত সামনে যাচ্ছি প্রকৃতির রূপ যেন মুগ্ধ করছে। আজকের পথ যেমন দুর্গম তেমনি বৈচিত্র্যময়। নাম না জানা পাখির ডাক,বুনো ফুলের ঘ্রাণ কষ্ট আর ভয়কে দূরে সরিয়ে মনকে শক্ত করছে। শেষপর্যন্ত কাঁঠালিয়া অর্থাৎ সুন্দরডুঙ্গা ভ্যালি পৌঁছলাম বিকেল পাঁচটায়। 'ডুঙ্গা' শব্দের অর্থ পাথর, সুন্দর সুন্দর পাথরে সাজান এই ভ্যালি আর তাই নাম সুন্দরডুঙ্গা। মাইকতলি গ্লেসিয়ার থেকে সৃষ্ট মাইকতলি নালা আর সুখরাম গুম্ফা থেকে আসা সুখরাম নালা মিশে এখানে সুন্দরডুঙ্গা নদী তৈরি হয়েছে। জায়গাটা যেমন শান্ত তেমনি ভয়ঙ্কর লাগছিল। এদিকে বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপটে আমাদের অবস্থা কাহিল। গরম সুপ আর আলু ভাজা খেয়ে একটু আরাম পেলাম। আজ মেষপালকদের ঘরে থাকব, খড়ের ছাউনি আর পাথরের তৈরি দেওয়াল। দুটি ঘরের মধ্যে আমরা দুজন একটিতে আর অন্যটিতে আমাদের সঙ্গীরা মেষপালকদের সঙ্গে রাতে থাকবে। সারা সন্ধে আগুনের পাশে বসে আমাদের গল্প চলতে লাগল। ভীষণ রোমাঞ্চকর পরিবেশ, এই সব মানুষ গুলো যারা আধুনিক জটিলতা থেকে দূরে সরল সাধাসিধে জীবন যাপন করছে তাদের সঙ্গে গল্প করতে কী যে ভাল লাগছিল কী বলব। এরা শহুরে জীবনযাত্রাকে ভীষণ ভয়ই পায়। কষ্টকর বিলাসহীন জীবনই এদের পছন্দ। এদের কোন চাহিদা নেই বলেই এরা ভাল থাকতে পারে। শুতে যাবার আগে রাতের আকাশ দেখে মনে হল হাজার বাতি জ্বলছে উপত্যকাতে । পোকামাকড়, জীব-জন্তু সব কিছুরই ভয় হচ্ছিল। প্রায় খোলা আকাশের নীচে শুয়ে রাতে তাই ঘুম এলনা।

পরদিন সকালে উঠে আকাশের মুখ দেখে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। ঠিক সাড়ে ছটার মধ্যে হাঁটা শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু আকাশের যা অবস্থা, আগে যাবার কথা মোটেও ভাবব না। জীবনের ঝুঁকি যেখানে সেখানে জেনে শুনে পা না বাড়ানোই ভাল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপট সহ্য করতে না পেরে ভিতরে গিয়ে বসলাম । ঈশ্বরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করছি যা দেখেছি সেটুকু পাথেয় করেই যেন নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরতে পারি। হঠাৎ নন্দু ভাইয়ার ডাকে চমক ভাঙল। বাইরে এসে দেখি কালো মেঘ সরে গিয়ে নীল আকাশে সূর্যদেব হাসছেন। একেই বলে প্রকৃতির খেয়াল। বিলম্ব না করে জিনিসপত্র রেখে বেরিয়ে পরলাম। ৬ কিমি কঠিন পথ হেঁটে বেলুনি টপে পৌঁছতে হবে। এদিকে কিছুক্ষণ পরই শুরু হল অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। দু-তিন কিমি যাবার পর আমি যেন হাঁটতেই পারছিনা। হাই অলটিচিউড সিকনেসে আক্রান্ত নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগছিল। রডোড্রেনডন গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে অনেকটা পথ যেতে হল। শেষ তিন কিমি পথ একাই হেঁটেছি কোন এক অদৃশ্য শক্তিকে ভর করে। তখন চার পাশের প্রাকৃতিক শোভা কিছুই আর চোখে পড়েনি। বেলুনি টপে পৌঁছে মনে হল সত্যি এই কষ্ট সার্থক। শুধু তাইনা জীবনে অসম্ভব বলে যে কিছু নেই তাও শিখলাম। বেলুনি টপে এসে আমি যে কী দেখলাম তা লেখার ভাষা নেই। মেঘমুক্ত নীল আকাশ, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ গালিচা আর ৩৬০ ডিগ্রিতে বিস্তীর্ণ হিমালয়। সত্যি আমরা এতটাই উঁচুতে আছি যে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় মৃগথিনু, থরকট, মাইকতলি পিক। সব কটির উচ্চতা ৬০০০ মিটারের বেশি। ধূপ জ্বেলে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম। ক্যামেরা অন করে ভাবছি কোন শট নেব যেদিকে তাকাই সেদিকেই চোখ আটকে যায়। দূরে হাজার হাজার ভেড়া চরছে, তাদের মালিক আমাদের কাছে এসে গল্প জুড়ে দিল। এতক্ষণ নিজের কষ্টের কথা মনেই ছিল না। নন্দুভাইয়া ফেরার কথা বলায় মনে পড়ল। কিন্তু এস্থান থেকে আজ ফেরা আর সম্ভব নয় । এসে যখন পড়েছি তখন দুপুর, বিকেল, রাত, ভোর প্রতিটি মুহূর্ত অমূল্য আমাদের কাছে। তাই পোর্টার তিনজন আমাদের টেন্ট, স্যাক, রেশন আনতে আবার নীচে গেল। আমাদের জিনিস এসে পৌঁছতে ঘণ্টা দুই সময় তো লাগবেই। এদিকে খিদেতে পেট জ্বলছে, আপাতত হাওয়া খেয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। হঠাৎ আকাশ কালো করে বৃষ্টির সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া শুরু হল। মেষপালক ভাইয়ের তাঁবুতে আশ্রয় নিতে হল। তার দুদিন ধরে জ্বর, সঙ্গে ওষুধ ছিল তাই দিলাম। বছরের পাঁচ-ছ' মাস কাটে আপনজনেদের ছেড়ে ভেড়-বকরিদের সঙ্গে এই দুর্গম জায়গায়। অক্টোবরে নীচে যায়। শীতে বাড়িতে বসে ভেড়ার লোম দিয়ে গরম পোষাক, কম্বল বানায়।

খিদে আর ক্লান্তিতে দুচোখে ঘুম এসে গেল। ঘুম ভাঙ্গতে দেখি পড়ন্ত বিকেলের আলোয় ভ্যালি এক অন্য রূপে সেজেছে। সে দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করতে ব্যস্ত হয়ে

www.amaderchhuti.com

বেলুনি টপ থেকে দেখা

পড়ি। ইতিমধ্যে আমাদের তাঁবুও রেডি। চা খেয়ে নিজেদের রিচার্জ করে নিলাম। দলে দলে ভেড়-বকরি ফিরে আসছে,সঙ্গে দুটো কালো পাহারাদার কুকুর, গলায় ঘণ্টা বাঁধা। অন্ধকার নামতেই ঠাণ্ডা জাঁকিয়ে পড়ল। কুকুরগুলো ছুটে ছুটে গা গরম করছে। কোনরকমে রাতের খাবার খেয়ে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পরলাম।

সকালে আকাশ মেঘমুক্ত। প্রথম আলো মৃগথিনু, মাইকতলি, থরকট, ভানোটি, আনন্দ পিক, অনন্ত পিক, দুর্গাকোটের মাথায় পরেছে। সেই স্বর্গীয় দৃশ্য এখনো চোখ বুজলেই দেখি। একটার পর একটা শট নিয়ে যাচ্ছে অনিন্দ্য, আমিতো চোখের পলক ফেলতে পারছি না।

চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম, গন্তব্য দেবীকুণ্ড। প্রথমেই একটা খাড়া চড়াই উঠে গেছে। ওঠার পর দূরের শৃঙ্গগুলোও যেন নাগালে এসে গেল। রডোড্রেনডন গাছে হাল্কা গোলাপি, বেগুনি ফুল দেখতে দেখতে দেখতে যেন হারিয়ে ফেলছি নিজেকে। এদিকে দ্রুত হাঁটার নির্দেশ আসছে। একসঙ্গে না থাকলে আজ পথ হারিয়ে ফেলার প্রবল সম্ভাবনা। দূরের একটা কালো পাথুরে পাহাড়কে সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছি। রাস্তা ভাল না জানা না থাকলে এপথে আসা একেবারেই উচিত নয়। গাইডরাও পথ ভুল করে, প্রকৃতির খেয়ালে অকস্মাৎ আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেলে সামনে এগোন যাবে না। তাই সময়, দূরত্ব হিসাব না করেই হেঁটে যাব। ১৪ হাজার ফুটের বেশি উচ্চতা, তাই গাছপালা কমতে কমতে আর একদমই নেই। অক্সিজেনের অভাবে কষ্ট হচ্ছে। ধীরে ধীরে এগোচ্ছি, মাঝে খাওয়ার জন্য একটা ব্রেক নিতে হল। তারপর আবার চলা। এপথে আমরা ছাড়া আর কোন জনপ্রাণী নেই। নির্জনতা যেন মাঝে মাঝে অসহনীয় হয়ে যাচ্ছে। আবার অপার্থিব সৌন্দর্য হাতছানি দিচ্ছে, এই চুম্বকের শক্তিকে উপেক্ষা করি কী করে? আরও কতটা,কতক্ষণ সময় লাগবে এসব প্রশ্ন করে নন্দুভাইয়াকে বিরক্ত করে যাচ্ছি দুজনে। ভাইয়া হাসতে হাসতে পাশে পাশে চলেছে আর লঞ্জেস, চুইংগাম যোগান দিচ্ছে,আর নানারকম কাহিনি বলে যাচ্ছে। এই কদিনে সে আমাদের সারাক্ষনের সঙ্গীও যেমন, তেমনি ভালো বন্ধুও হয়ে গেছে। খাড়া চড়াই উঠতে উঠতে প্রাণান্তকর অবস্থা। আবার গতকালের মত কষ্ট শুরু হয়েছে আমার। অনিন্দ্য কষ্ট দেখে ফিরে যেতে অনুরোধ করল। কিন্তু আজ মনে হল আমি মরি-বাঁচি যাবই। ওইতো দূরে সুখরাম গুম্ফা দেখা যাচ্ছে।

সুখরাম গুহার বেশ খানিকটা অংশ নষ্ট হয়ে গেছে, আগে মেষপালকেরা হাজার হাজার ভেড়া নিয়ে এখানে রাত কাটাত। কয়েক বছর আগে একদল ট্রেকার আসে। রাতে তারা এই গুহায় নাচ-গান, হৈচৈ-এ মেতে ছিল গাইডের নিষেধ অমান্য করেই। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস শান্ত দেবভূমিকে অপবিত্র ও অশান্ত করায় দেবী রুষ্ট হন। পরদিন সকলের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তবে গাইড বেঁচে যায়। এই গল্প শুনে এই আধুনিক যুগেও আমরা শিহরিত হলাম। হাতে সময় থাকলে মাইকতলি গ্লেসিয়ার ঘুরে আসা যায়। আরও একদিন লাগবে সুখরাম গুহা দেখার জন্য। আমরা যে রুটে যাচ্ছি সেখান থেকে আরও কঠিন পথ গেছে নাগকুণ্ডে। সেখান থেকে কানাকাটা পাস পেরিয়ে করে জাতোলিতে নেমে যাওয়া যায়। তবে সে পথ সাধারণ ট্রেকারদের জন্য নয়।

দূর থেকে এতক্ষণ কালো পাহাড়ের গায়ে যেন সাদা চকের দাগ বলে মনে হচ্ছিল, কাছে এসে দেখি ছোট ছোট হিমবাহ। আশ্চর্য হয়ে সে দৃশ্য দেখতে দেখতে আছাড় খেতে গিয়ে কোনক্রমে বেঁচে গেলাম। এদিকে আবহাওয়া খারাপের দিকে। পাথরে হোঁচট খেতে খেতে কয়েকবার বেঁচে গেলাম, কখনো কখনো মনে হচ্ছে বুঝি পথ হারিয়ে ফেলেছি, রাস্তা যে আর শেষ হয় না! এক জায়গায় পাথরে পা রাখা যাচ্ছে না শুকনো ঝুরো মাটির ওপর দিয়ে খাড়া চড়াই। দুজনেই নন্দুভাইয়ার হাত ধরে উঠলাম। তারপর হলুদ ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হল কিছুটা। এদিকে আকাশে কালো মেঘ জমছে, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া চলছে। এবার শক্ত বরফের রাস্তা হেঁটে শেষ চড়াই পেরলাম। এত কষ্ট সত্যিই সার্থক হল। তিনদিকে বরফাবৃত পাহাড়,আর তারই মাঝে স্বচ্ছ জলের সরোবর দেবীকুণ্ড। এখান থেকে বাম দিকে নেমেছে ২২,৩২০ ফুট উঁচু মাইকতলি পিক থেকে মাইকতলি হিমবাহ। ডানদিকে পানওয়ালিদ্বার ২১,৮৬০ ফুট, বালজৌরি কল ১৯,৮৫৭ ফুট। তার সামনে রকি পিক। আমরা ভক্তিভরে দুজনে পুজো করলাম আর তার ভিডিও তুলল নন্দুভাইয়া। তবে সেই গা ছমছমে পরিবেশের অনুভূতি ক্যামেরাবন্দী করতে পারিনি। এখানে এসে এটাই মনে হয়েছে সর্বশক্তিমান আজও আছেন। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য জলের গভীরতা কমে গেছে তবে স্বচ্ছতা দেখার মত। শুনলাম সর্বক্ষণ এক পক্ষী পাহারায় আছে।

দেবীকুণ্ডের সামনে আমাদের গাইড নন্দু ভাইয়া

www.amaderchhuti.com

ঘণ্টা খানেক সময় কাটিয়ে কুণ্ডের জল মাথায় দিয়ে আমরা ফেরার পথ ধরলাম। এবার আর ভয় নয়, জয়-এর আনন্দ মন জুড়ে। দুপুর আড়াইটে বাজল তাঁবুতে ফিরতে। খিচুড়ি-আচার দিয়ে পেটপুজো সেরে ফেরার পালা। আগামীকাল জাতোলি পৌঁছতে হবে।

পরদিন সকালে ৫ টার আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠেই শেষবারের মত খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির মায়াময় রূপ দুচোখ ভরে দেখে নিলাম। এই ভ্যালি ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না। ফেরার সময় প্রায় পুরোটাই উতরাই। তাড়াতাড়ি নামতে শুরু করলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই বৃষ্টি এল। কোনক্রমে রেনকোট পরে আবার হাঁটা। কখনও জোরে,কখনওবা আস্তে অবিরাম বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। বিকেল ৪টেতে আমরা জাতোলি এসে ঢুকলাম। ব্যাগের বেশিরভাগ জামা-কাপড়ই ভিজে গেছে। কোন রকমে খুঁজেপেতে একটা আধশুকনো জামা জুটল, তাই পরে খেয়ে লম্বা টানা ঘুম দিলাম। অনেকদিন পর ভাল ঘুম হল।

সকালে উঠে দেখি দূরের সব পাহাড় বরফে ঢেকে গেছে,আকাশে মেঘের কালো চাদর সরে যায়নি এখনও। বেশি দেরি না করে জাতোলি থেকে রিটাং, তারপর খাতি গেলাম। পিণ্ডারি যেতে এই গ্রাম পড়ে। দিন দশেক পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরাঘুরির পর রোদে বসে দলে দলে মানুষের পিণ্ডারি-যাত্রা দেখা বেশ উপভোগ্য। এখান থেকে বিকালে গ্রামটা ঘুরে দেখে নিলাম নিজেরা। দূরের পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার ভীষণভাবে টানছিল। যাবার সময় যে পথ ক্লান্তিকর লাগছিল এখন সেই পথ, সেই জায়গা ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। কিন্তু আর নয়, এবারে সমতলে ফেরা, ঘরে ফেরা। আবার অপেক্ষা হিমালয়ের ডাকের।

সুন্দরডুঙ্গা ট্রেক রুট ম্যাপ || ট্রেকের আরো ছবি

নিজের সংসারকে সুন্দর করে রাখার ছাড়াও ঝুমা ভালোবাসেন অনেককিছুই। তাঁর ভালোলাগা-ভালোবাসার তালিকায় বই পড়া, গান শোনা, নতুন নতুন রান্না করার পাশাপাশি রয়েছে ইন্টারনেট সার্ফ করে পাহাড়ের ছবি দেখা আর নানা ট্রেককাহিনি পড়া। তাঁর কাছে সবার চেয়ে প্রিয় এই ট্রেকিং-ই। পাহাড়ের ডাকে বছরে অন্তত দুবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েনই। আর এই বেড়ানোয় তাঁর সঙ্গী প্রিয়জনদের তালিকায় রয়েছে ডায়েরি আর কলমও।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like One person likes this. Be the first of your friends.
tell a Friend

পুজোয় প্রবাসে

মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তমীর সকালে হিথরো এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখি প্লেন দেরি করায় গন্তব্যে পৌঁছানোর শেষ বাসটাও ছেড়ে গেছে, এরপর আবার বারো ঘন্টা পরে আসবে। আলোয় ঝলমল কলকাতাকে ফেলে আসার সময়েই মনে হচ্ছিল বিদেশের মাটিতে পুজো কেমন কাটবে কে জানে! যাচ্ছি নিউ কাসেলে দিদির বাড়িতে, লন্ডনে পুজো দেখার একটা নতুন অভিজ্ঞতার আশায়। কিন্তু ভিক্টোরিয়া স্টেশনে অলসভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা পায়চারি করতে করতে আর বার্গার, সসেজ ইত্যাদি খেতে খেতে শুরুটা বিশেষ ভালো হল বলে তো বোধ হচ্ছে না। লন্ডনের নিত্য ব্যস্ততার মাঝে আমি যেন একাই শুধু ভেবে যাচ্ছি আজ সপ্তমী আজ সপ্তমী, কিন্তু টের পাচ্ছি কই?

মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বিমানে বসে জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য দেখে মন ভরে গেল, বলা ভাল একটু মন কেমন করে উঠল বৈকি। এই প্রথম পুজোর সময় কলকাতা ছেড়ে বিদেশে যাচ্ছি। ফিরে ফিরে তাকাই নীচের দিকে যতক্ষণ নজরে আসে - আলোর বন্যায় ধুয়ে যাচ্ছে শহর কলকাতা। শুনেছিলাম প্যারিস সারাবছর আলোর রোশনাইতে মাতোয়ারা থাকে বলে সেই শহরের আরেক নাম 'সিটি অফ লাইটস'। সেদিন উড়ান থেকে আলোর সাজে মোড়া কলকাতাকে দেখে মনে হচ্ছিল এ যেন আমাদের 'আলোক নগরী'।

হিথরো এয়ারপোর্ট সংলগ্ন এলাকাগুলিতে কিম্বা ভিক্টোরিয়া স্টেশনের চারপাশে দুর্গাপুজোর কোন জাঁকজমকই চোখে পড়ল না। মনটা বেশ দমেই গেল। এবারে তাওতো পুজোর দিনেই পুজোর আয়োজন, অনেকসময়তো ছুটির অভাবে হপ্তাহান্তেও দুর্গাপুজো হয়। দীর্ঘ বাস জার্নি করে ক্লান্ত হয়ে দিদির বাড়ি পৌঁছে ফ্রেস হয়ে একটু বিশ্রাম নিলাম। তারপরে সবাই মিলে ভারতীয় পোষাকে দিদিদের সঙ্গে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়লাম কমিউনিটি হলের উদ্দেশ্যে। সেখানেই দুর্গাপুজোর আয়োজন হয়েছে। কমিউনিটি হলটি বেশ বড়। কিন্তু আমার মন যে খালি কলকাতার পুজোর সঙ্গে তুলনা করে চলেছে তাই আলোটালো সব মিলিয়ে প্রথমটায় একটু নিষ্প্রভই ঠেকল। সিলিং থেকে ঝোলানো কয়েকটা ঝাড়বাতির মৃদু আলোয় আলোকিত হয়ে রয়েছে হলটি। মনে হচ্ছিল এ যেন কলকাতার কোন বনেদী বাড়ির পুজো। ঝলমলে আলো, বড় প্যান্ডেল কিম্বা মাইকের আওয়াজ নেই, তবে রয়েছে গভীর আন্তরিকতা,ভক্তি ও নিষ্ঠা।

সবাই পুজোর কাজে বেশ ব্যস্ত। কলকাতার কুমোরটুলি থেকে মা তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে উড়ানের কারগোতে বাক্সবন্দী হয়ে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে পৌঁছেচেন প্রবাসী সন্তানদের কাছে মাত্র দুদিনের জন্য। প্রতিমার সাজসজ্জা, পুজোর আয়োজন সবেতেই নিখাদ বাঙালিয়ানার ছোঁয়া। চারপাশের পরিবেশ বেশ গম্ভীর। ধুতিপরা অল্পবয়সী একটি ছেলে ইংরেজি উচ্চারনে ঠাকুরের মন্ত্র পড়ছে। কাছে গিয়ে দেখি মন্ত্রগুলি ইংরেজি হরফে লেখা। বুঝলাম সে বাংলা পড়তে পারে না। আসলে পুরোহিত বলে কিছু নেই এখানে, ব্রাহ্মণের ছেলে বলে তাকে পুরোহিতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে দেখলাম পুজোর কাজে সে রীতিমতো পটু। একা হাতেই পুজোর যাবতীয় আচার নিখুঁতভাবে করছে। মহাষ্টমীর অঞ্জলি দিলাম। গঙ্গাজল বড়ই বাড়ন্ত, তাই কয়েকফোঁটা গঙ্গার জল সবার ওপর ছিটিয়ে শান্তি জলের পর্ব চুকল। অঞ্জলির প্রসাদ খেতে গিয়ে দেখি বিচিত্র সব ফলমূল। ব্ল্যাক আর রেড কিউব্যান্ট, প্লাম, গ্রিন অ্যাপেল, স্ট্রবেরি। বেশ মজা লাগল আমাদের শশা, কলা, শাঁকালুর পরিবর্তে বিদেশি ফলের প্রসাদ খেতে। শুভ্রাংশুতো তার মধ্যেই খুঁজে পেতে নারকেল নাড়ু (যা কলকাতা থেকে প্যাকেটে করে প্লেনে চড়ে এসেছে) দু'চারটে নিয়ে মুখে পুরে ফেলল। দুপুরে লুচি, মশলাবিহীন আলুর দম আর ছোলার ডাল - চমৎকার লাগল। সন্ধ্যেবেলায় বেশ ধুমধামের সঙ্গেই আরতি হল।

হ্যারো আর্ট সেন্টার, লণ্ডন

নবমীর দিন সকাল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, কনকনে ঠান্ডা হাওয়া, মাঝে মধ্যে নির্মল নীল আকাশ। ইংলন্ডের এই আবহাওয়াতেও ঢাকের আওয়াজ লন্ডনের মাটিতে কলকাতার পুজোর আমেজ এনে দিচ্ছিল। ঢাকি নেই, ঢাকের সিডি সাউন্ড সিস্টেমে বেজে চলেছে অবিরত। দিদির মুখে শুনলাম কোন কোন বছরে ঢাক আর কাঁসর এনেও রাখা হয়। যা ঢাকির বদলে এখানকার বাঙালি পুরুষেরাই বাজান। দুর্গা প্রতিমার চোখ জুড়ানো সাজসজ্জা, শাঁখের আওয়াজ, ধুনোর গন্ধ, ধূপের ধোঁয়া, প্রদীপের আলো, প্রবাসী বাঙালি পুরুষদের ধুতি-পাঞ্জাবী পরে ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি, শাড়ি পরা মহিলাদের চুড়ির রিনিঠিনি - এতো কলকাতারই পুজোর ছায়া। শুধু দু-একজন সোয়েটার পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কয়েকজনতো উইন্ডচিটার গায়েই অঞ্জলি দিলেন। আবার এসব চোখে পড়লেই মনে হচ্ছে কলকাতা থেকে কতদূরে ভিন দেশের পুজোর আস্বাদ নিচ্ছি।

নবমীর রাতেই দশমীর শেষ পুজো। ছুটি শেষ, পরের দিন থেকেই সবার রোজকারের কাজকর্মের দিন শুরু হবে। পাঁচদিনের আনন্দোৎসব তাই দুদিনেই সমাপ্ত।

বিসর্জনের রেশ লেগেছে সবার মনেই। সাদা গরদের শাড়ি পরে অনাবাসী ভারতীয় মহিলারা একে অপরকে সিঁদুরের লাল রঙে রাঙিয়ে তুললেন, বাদ গেলামনা আমি আর দিদিও। বিসর্জনের নাচেও বেশ নতুনত্বের ছোঁয়া। সেইসময় গুজরাটিদের 'নবরাত্রি' অনুষ্ঠান থাকায় একইসঙ্গে তাঁরাও ডান্ডিয়া নেচে নিলেন। মনে হল এ যেন 'মিনি ইন্ডিয়া'।

ভাবলাম যাইহোক টেমস নদীর জলে ঠাকুর বিসর্জন দেখার সুযোগ হবে। কিন্তু এতো আর কলকাতা নয় যে গঙ্গার জলে ভাঙ্গা কাঠামো আর পচা ফুল-বেলপাতা জমতেই থাকবে। জলদূষণ এড়াতে এখানে মায়ের বিসর্জনই হয় না। বিসর্জনের নাচের পর দৃশ্যটা একটু খারাপই লাগল - মা দুর্গা ছেলে-মেয়ে সমেত একে একে পর্যায়ক্রমে হাত-পা খুলে খুলে পার্ট বাই পার্ট আশ্রয় নিলেন প্যাকিং বাক্সে। আগামী বছর জুড়ে নিয়ে আবার পুজো করা হবে।

রাতে বিজয়া দশমীর জম্পেশ খাওয়া-দাওয়া - ফ্রায়েড রাইস, ল্যাম্ব, চাটনি আর কলকাতা থেকে ক্যানে বন্দী হয়ে আসা কে সি দাসের রসগোল্লা। তারপর প্রবল ঠান্ডার মধ্যে একে অপরকে শুভ বিজয়া জানিয়ে দিদির বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। কাল আবার অন্যত্র পাড়ি দেব।

ক্যামডেন, লণ্ডন

www.amaderchhuti.com

মহুয়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে তুলনামূলক সাহিত্য এবং ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতোকোত্তর করে বর্তমানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছোট গল্প ও ভ্রমণকাহিনি লেখেন। ভালবাসেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ও জীবনানন্দের কবিতা পড়তে। সময় সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়েন দেশে-বিদেশে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

আমেরিকার 'কার্নিভাল স্প্লেনডর' ও কলকাতার বনানীদি

বনানী মুখোপাধ্যায়

~ পুয়ের্তো রিকো, সেন্ট টমাস ও গ্র্যাণ্ড তুর্ক আইল্যাণ্ড ক্রুজের আরো ছবি ~

অন্যান্যবারের মত এবারও জুন মাসে পৌঁছলাম আমেরিকায়, ছেলেমেয়ের কাছে। মাসখানেক আনন্দেই ছিলাম হঠাৎই বিনা মেঘে বজ্রপাত। আমাকে নাকি ওদের সঙ্গে ক্রুজে যেতে হবে! সে আবার কী? আমি সেখানে গিয়ে কী করব? সাতদিন সাগরে ভেসে থাকা? ও বাবা, সে আমার দ্বারা হবেনা, আমার তো জল দেখলেও চিত্ত বিকল, না দেখলেও চিত্ত বিকল। কিন্তু আমার চিত্ত বিকলে তাদের চিত্ত বিচলিত হলনা। আমাকে যেতেই হলো।

নিউইয়র্ক স্কাইলাইন

www.amaderchhuti.com

৫ ই অগাস্ট ২০১৩, মনের কষ্ট মনেই রেখে হাজির হলাম নিউ ইয়র্ক বন্দরে। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল এগারতলা জাহাজ। সবাই খুবই খুশি, আর আমি? থাক, সে কথা না বলাই ভালো। জাহাজ ছাড়ল। শুনলাম এই জাহাজের গন্তব্য তিনটি দ্বীপ। আবার তিনটি কেন? একটি দেখে ফিরে এলেইতো হয়। না, তা হবেনা। সবেতেই বাড়াবাড়ি। আমরা ছ'তলার বাসিন্দা হব। উহঃ, ভগবান!

জাহাজের ভেতরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছেনা যে সেটা আদৌ চলছে কীনা। আমরা ছ' তলায় আছি, ভেতরটা পাঁচতারা হোটেলের মত। একেবারে ঝলমল ঝলমল করছে। ব্যালকনিতে এসে সমুদ্র দেখছি। যৎদূর দেখা যায় জল,জল শুধুই জল। ধীরে ধীরে নিউ ইয়র্ক শহরটা আমাদের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। চলে গেল এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার...। মনের ভেতর শুধু দুটি শব্দ ঘোরাফেরা করতে লাগলো 'টাইটানিক' আর 'দেবতার গ্রাস'!

জাহাজের নাম কার্নিভাল স্প্লেনডার। কার্নিভালই বটে। কীযে হচ্ছেনা এর ভেতর তা বলতে পারবনা। শুনলাম এর ভেতরে নাকি সবশুদ্ধু ৩৬০০ লোক। বাপরে, ভাবতে অবাক লাগছিল যে এতগুলো মানুষকে নিজের বুকের ওপর চাপিয়ে জাহাজের একটুও হেলদোল নেই? বলিহারি বাবা! কেমন নিজের মনে গন্তব্যের দিকে চলেছে! এখানকার খাওয়া মানেতো এলাহি ব্যাপার। লাইনে দাঁড়াও আর খাবার নাও, যত পার খাও রকমারি খাবার। রকমারি মানুষ, রকমারি পোশাক, চারদিকে রঙের বাহার,আমার কাছে সবটাই অন্য রকম লাগছে। তিনদিন পর আমরা দ্বীপে নামব। জানিনা, সেখানে গিয়ে কী দেখব।

জাহাজের সুইমিং পুলে

আজ ৮ই অগাস্ট, একটু পরে আমরা নামব সান জুয়ান, পুয়ার্তো রিকো-তে। বেলা বাড়তেই দূরে সমুদ্রের ওপর দেখা যেতে লাগলো সবুজে কালোতে মেশানো একটা কিছু। না,জাহাজ নয়,স্পিড বোটও নয়। খানিক বাদে তিনি আরও একটু এগিয়ে এলেন। আমার মেয়েও তার বিশাল ক্যামেরাতে পটাপট ছবি তুলতে লাগলো। এইবার তিনি, মানে দূরের বস্তুটি অনেটাই সামনে এসে গেছেন,দেখতে খুব পুরনো দুর্গের মত। তারপর বাড়িঘর ছোটবড় নানা রকমের। ভূগোলে দেখা নাম পুয়ার্তো রিকো এখন আমার চোখের সামনে। বিশাল জায়গা নিয়ে তিনি বসে আছেন মহাসমুদ্র আটলান্টিক-এর মাঝখানে। কী আশ্চর্য!

সান জুয়ান,পুয়ার্তো রিকো

জাহাজ থেকে নেমে একটা বাসে উঠলাম। ড্রাইভারটি ভালো গাইডও। আমার মেয়ে তাকে অনুরোধ করলো একটু পুরনো শহরটিতে নিয়ে যাবার জন্য। এখানে রাস্তার পাশে প্রচুর গাছ,বিশেষ করে তাল গাছ, যতদূর যাচ্ছি তত দূরই গাছ। দুধারে বিশাল বিশাল বাড়ি। বিরাট অফিস,খুবই আধুনিক। ভাবতেই পারছিলাম না একটা দ্বীপ, যার চারদিক আটলান্টিকে-এ ঘেরা, সেখানে এতলোক থাকে? কেন থাকে? কী জানি, নিশ্চয় ভালোলাগে, তাই। খানিকটা এসে গাড়ি থামল। এবার আমরা দুর্গ দেখব। বিরাট ফোর্ট, এখন প্রায় ভগ্নদশা। সমুদ্রের গায়ে গা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য লাগলো দুর্গের ভেতরে কোনো গাছ না দেখে। অতবড় বিশাল জায়গায় একটাও গাছ নেই। শুনলাম বাইরে থেকে শত্রু এসে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আক্রমণ করত, কাউকে দেখা যেতনা তাই সব গাছ কেটে ফেলা হলো যাতে শত্রুকে পরিস্কার দেখা যায় - এই হলো বৃত্তান্ত। গাছ না থাকার রহস্য পরিস্কার।

এবার আবার জাহাজে ফেরার পালা। ফেরার পথে দেখলাম গতবছরে ঘটে যাওয়া 'স্যান্ডি'-র তান্ডব লীলা। সমুদ্রের কাছাকাছি কোন বাড়িরই চিহ্ন নেই। একেবারে ছন্নছাড়া অবস্থা, কিন্তু কিছু জায়গায় বেশ তৎপরতার সঙ্গে নতুন বাড়ি ঘর তৈরী হয়ে গেছে। কত,কত বছরের পুরনো দ্বীপ কেমন ছোটখাটো শহর হয়ে উঠেছে। ভালো লাগলো না বলে বলা উচিত রোমাঞ্চ হলো। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে বনানীদি প্লেন-এ উঠতে ভয় পায়। জল দেখলে ভয় পায়, সে সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে এখানে কী করছে? কী জানি!

বাস থেকে নেমেই মনে হলো এবার কিছু খাওয়া দরকার। কিন্তু রাস্তায় এত ভিড়, খাবার জায়গাই দেখতে পাচ্ছিলাম না। ড্রাইভারটি বলেছিল, আজ এখানে মেলা বসেছে। সত্যিই মেলা। চারদিকে অনেক রকমের স্টল বসেছে, ঠিক আমাদের দেখা মেলার মত। রাস্তার মাঝখানে বেঞ্চ, চেয়ার দিয়ে খাবার জায়গা, সেখানে লোকেরা খাচ্ছে। আমরা সেখানে না খেয়ে একটা রেস্তোঁরাতে ঢুকলাম। খাবারের অর্ডার দিয়ে বসে আছি তো বসেই আছি, খাবার আর দেয়না। মেয়ে জামাই নাতি তিনজনেই খুব চটে গিয়ে মুখ লাল করে বসে রইলো। যখন উঠে পড়ব মনে করছি,তখনই খাবার এলো। কিন্তু রেগে রেগে কি আর খাওয়া যায়? কোনরকমে খেয়ে চলে এলাম। বাইরে তখন মেলা জমজমাট। আমরাও কিছু কিনব ভাবলাম কিন্তু বড্ড ভিড়। তাই আর ও পথে গেলামনা। কিন্তু দেখতে খুব ভালো লাগছিল। এখানকার লোকেরা খুব হাসিখুশি,আনন্দময় বলে মনে হলো। অন্ধকার হয়ে গেছে। দূর থেকে আলো ঝলমল জাহাজটাকে দেখে এত সুন্দর লাগছিল যে বলে বোঝাতে পারবনা। এবার আটলান্টিকে তার ছায়া দেখে একবারও ভয় পেলামনা,একবারও মনে হলনা জাহাজটা মহাসমুদ্রে ভাসছে। আজকের এই অভিজ্ঞতা,পুয়ার্তো রিকোতে কিছুসময়ের জন্যে দ্বীপবাসিনী হয়ে যাওয়া, চিরদিন মনে থাকবে।

সান জুয়ান,পুয়ার্তো রিকো

www.amaderchhuti.com

সেন্ট থমাস, দ্য ভার্জিন আইল্যান্ড

আজ ৯ ই আগস্ট ২০১৩। আজ আবার অন্য আর একটা আইল্যান্ড-এ যাব। এই দ্বীপের নাম সেন্ট থমাস, দ্য ভার্জিন আইল্যান্ড। নামের তো কায়দা অনেক, তবে কী দেখব, সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। তাছাড়া এনার আরেকটি নামও আছে - শপিং ক্যাপিটাল - সেটাই তো মাথা খারাপ করার পক্ষে যথেষ্ট। সবাই খুব খুশি।

বেলা বাড়তেই তেনাকে একটু একটু দেখা যেতে লাগলো। প্রথমে একটু, তারপর আর একটু, তারপর আরও অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে আছেন সেন্ট থমাস। আমার তো দূর থেকে দেখে মনে হলো পুয়ার্তো রিকোর থেকে আরও বড়। দূরের থেকে কাছে আসতেই দেখা গেল সেখানে অনেক গাড়ি চলাচল করছে। মানে ব্যাপারটা মোটেই গ্রাম গ্রাম নয়, বেশ ভালোই শহর শহর ছাপ। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম কখন থমাস বাবু আমাদের একদম কাছে এসে যান। অবশেষে তিনি একেবারে জাহাজের পাশে এসে গেলেন। অবাক হয়ে ভাবছিলাম চারিদিকে অতলান্তিক মহাসাগর দিয়ে ঘেরা যে দ্বীপ, যেখানে সবসময়েই সমুদ্রের ঝড়ে ভেসে যাবার সম্ভাবনা,সেখানে মানুষ কোন ভরসায়,কোন সাহসে জনবসতি গড়ে তোলে? এখানকার 'ক্যাথেরিন' আর 'স্যান্ডি'-র দাপট তো দেখলাম, তা সত্বেও!?

জাহাজ থেকে নেমেই একটা ছোটখাটো বাসে উঠলাম। শুনলাম শহর দেখে তারপর আমরা সমুদ্র সৈকতে যাব। বাস ড্রাইভারের অবস্থাটা একটু টলোমলো। তাই বাসটাও টলোমলো। চালকের নাম ববি। আমার মনে একটাই গান - 'ববি খো যায়'! এই ববির যা অবস্থা তাতে সত্যি সত্যি হারাবে না তো? সে মাইক্রোফোনে কী বলছে সেটা সেই বুঝতে পারছে, যাত্রীরা নয়। আমরা নিজেরাই বুঝতে চেষ্টা করলাম আমরা কী দেখছি!

খুব সরু রাস্তা। একপাশে পাহাড় আর আরেক পাশে সমুদ্র। খুবই মনোরম দৃশ্য। বাড়িগুলো অনেকটা পুরনো দার্জিলিং-এর মত। এরকম সরু রাস্তায় বেশিরভাগই দেখেছি একপাশে জঙ্গল আর আরেক পাশে গভীর খাদ,এখানে সেটা নয়। যাক্, অন্তত ববি আমাদের খাদে ফেলবেনা এইটা ভেবে নিশ্চিন্ত হলাম। একে খুব সরু রাস্তা,তার ওপর একবার সোজা একমিনিটে ওপর থেকে নীচে। আবার নীচে থেকে ওপরে। বাবারে,প্রায় যায় আর কী। যাই হোক,দৃশ্য দেখা শেষ,ববি আমাদের সৈকতে নাবিয়ে দিল। ব্যস,আমারও বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে গেল,কারণ আমার মেয়ে আর নাতি সমুদ্র স্নান করবে। কিন্তু ঝামেলা হলো যে সুইমিং কস্টিউম আনা হয়নি। সমুদ্রে এসে স্নান করবনা, এর চেয়ে বড় পাপ আর হয়না (আমার মেয়ের মতে), তাই জোর করে দোকান খুলিয়ে এযুগের মাতঙ্গিনী স্নান বস্ত্র ক্রয় করিলেন। আমি আর জামাই চুপচাপ গিয়ে ডেকচেয়ারে বসে পড়লাম।

ঘন্টা দেড়েক বাদে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা ছেলেকে জল থেকে উঠতে হলো। আবার ববির বাস। এবার চালক আর একটু টলোমলো। তবুও উঠতেই হলো। শহরে এসে সবাই বাস থেকে নামলাম। হঠাৎ মনে হলো আমরা তো আজ ম্যাজিক আইস দেখব। কোথায় সীতা, কোথায় সীতার মত কোথায় ম্যাজিক আইস, কোথায় ম্যাজিক আইস বলতে বলতে আমরা অবশেষে পৌঁছলাম সেখানে। শুনলাম ওই বাড়িটার ভেতর একটি ঘর পুরোপুরি বরফ দিয়ে তৈরি। ভয় পাচ্ছিলাম ঠিকই। কিন্তু দেখতে ইচ্ছেও করছিল। সবাইকে এস্কিমোদের ড্রেস পরতে হবে। পরলাম। ঠিক যেন ভূগোলে পড়া এস্কিমো। সর্ব অঙ্গ ঢাকা, শুধু মুখমন্ডল দৃশ্যমান। ঢুকলাম সেই ঘরে। বাপরে,চারিদিক শুধুই বরফ,দেয়াল ছাদ সব। তার ভেতরে নানা রকম মূর্তি, গাছ পালা,বাড়ি ঘর,রাজা রানি এমনকি যিশু পর্যন্ত আছেন বরফে ঢেকে। সত্যি খুব ভালো লাগলো।

সেন্ট থমাস, দ্য ভার্জিন আইল্যান্ড

বাইরে বেড়িয়ে মনে হলো এবার খাওয়া দরকার। এখানে প্রচুর গয়নার দোকান। সেখানে যাওয়া হলো। আমার এগারো বছরের নাতি আমায় একটা হার কিনে দিল। আমার পাওয়া সেরা উপহার। দূর থেকে জাহাজটাকে দেখা যাচ্ছিল,আমি ভাবলাম বাপরে,ওই অত বড় জাহাজে চেপে আমরা এসেছি? আবার ভয়,আবার বনানীদির বুক ঢিপ ঢিপ শুরু হয়ে গেল। জাহাজের থেকে চোখ সরিয়ে খাবারের দোকান খুঁজতে লাগলাম। সবাই একবাক্যে একটি নাম বলল গ্ল্যাডিস কাফে। চললাম সেখানে। দোকানের মালিক এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা,তিনিই গ্ল্যাডি। সবাই মহিলা,সকলেই ওখানকার লোক,একটু পুরনো ধরনের রেস্তোরা। পুরনো গান বাজছে - ন্যাট কিং কোল-এর গান। আমার মন খারাপ করতে লাগলো। আমাদের ছোটবেলার গান,আমাদের বাড়িতে এই সব রেকর্ড ছিল। খাব কী, আমারতো তখন চোখে জল। মালকিন গ্ল্যাডিও সঙ্গে সঙ্গে গাইতে লাগলো। নিজের খুশিতে,মনের আনন্দে। খাওয়া সেরে জাহাজের দিকে পা বাড়ালাম,দেখে মনে হচ্ছিল কাছে,কিন্তু তা নয়,অনেকটা ঘুরে যেতে হবে। বুড়ি বনানীদির পক্ষে সেটা খুব সহজ হবেনা,অতএব ট্যাক্সি ধরা হলো। আবার জাহাজ।

রাত্তিরে আবার হলে খেতে যাওয়া। ইন্দোনেশিয়ান ইমাদে যে কী করে আমাদের চারজনের নাম পটাপট বলছে,ভাবতে অবাক লাগছে। একটা ভারী সুন্দর অল্পবয়সী ছেলে আছে, তার নাম দেবা,যখন মিষ্টি করে আমায় নমস্তে বলে, তখন কী যে ভালো লাগে। রাত সাড়ে ন' টায় রোজ নাচ-গান হয়, ইন্দোনেশিয়ান ভাষায়,আমার মেয়েও ওদের সঙ্গে নাচে। ওরা খুব উপভোগ করে। এখানে এখন আমার জন্যে স্পেশাল ইন্ডিয়ান নন ভেজ খাবার আসছে, সবই আছে শুধু পোস্তটা নেই, তাহলেই সর্বাঙ্গ সুন্দর হত। এবার ঘরে ফেরা। উঠতে গিয়ে মনে হলো, আচ্ছা? জাহাজটা কি দুলে উঠলো? ওঃ ভগবান, যত ভাবি ওসব ভাববনা, ততই ভাবনারা আমাকে ভাবায়। আর পারিনা। টাইটানিক ছবিটা কি না করলে চলছিলনা?

দশই অগাস্ট, ২০১৩ - আজ আবার আর একটা আইল্যান্ড-এ যাব, গ্র্যান্ড তুর্ক। বাবা, এত বার দ্বীপ দেখারই বা কী আছে! বেশ তো ভালোই আছি আয়েশ করে জাহাজে, শুধু শুধু দ্বীপবাসিনী হবার কি দরকার? কিন্তু আমিতো কলকাতার বনানীদি, সেখানে আমার কথা সবাই শুনবে। আর এখানে? থাক,ওসব কথার কোনো দরকার নেই।

গ্র্যান্ড তুর্ক আইল্যান্ড

আজ আর কোনো গাড়িতে চাপতে হলনা। জাহাজের লাগোয়াই সৈকত। ছোটখাটো জায়গা। চারদিকে পাম গাছ। বেশ মনোরম। মেয়ে আর নাতি তরতর করে জলে নেমে গেল আর আমরা দুজন যথারীতি ডেক চেয়ারে শুয়ে পড়লাম। কারণ আমরা তো আর জলপথের লোক নই। আর একটু পরেই তেনারা জল ছেড়ে উঠে পড়লেন কারণ আজ আরও দারুণ কিছু ঘটার কথা। ওনারা আজ ঘোড়ার পিঠে চেপে সমুদ্রে নামবেন। ঘোড়াগুলোর কথা ভেবে খুব খারাপ লাগলো। বেচারা। কিছু বলতে পারবেনা। আমারই মত অবস্থা আরকী! প্রথমে ঠিক ছিল আমি আর জামাই জাহাজে থাকব, ওরা মা আর ছেলে ঘোড়ায় চেপে সমুদ্রে নামবে। আমার তো মহা আনন্দ। আমায় যেতে হচ্ছেনা, ওই ভয়ঙ্কর দৃশ্যও দেখতে হবেনা। কিন্তু কী করে সব বদলে গেল জানিনা। শেষপর্যন্ত আমাদেরকেও যেতে হলো প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

গাড়ি চলল। খুব যে কিছু দেখার আছে তা নয়। বেশিরভাগটাই জল। আর গাছপালা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাড়ি। ছোটখাটো অফিস। লোকজন কিছু দেখলামনা। গাড়িতে মোট দশ জন লোক। সবাই ঘোড়ায় চাপবে। চারদিকে শুধুই জল, ঘন নীল,কোথাও সরু হয়ে গেছে,আবার কোথাও বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। বেশ খানিকটা পথ যাবার পর হঠাৎ সবাই বেশ খুশি খুশি ভাব দেখাতে লাগলো। বুঝলাম আচমকা ভেসে আসা আস্তাবলের গন্ধে ওরা এত আনন্দিত। দেখতে পেলাম বালির ওপর কয়েকটা ঘোড়া চেন দিয়ে বাঁধা আছে। যারা ঘোড়ায় চাপবে,তারা চটপট ছুটল সেই দিকে। সবাই সুইমিং কস্টিউম পরেই ছিল তার ওপর গাইডরা একটা লাল মত ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল কোমরে। সকলের সঙ্গে আমার নাতি তিতাস আমাকে হাসিমুখে বাই দিদান বলে মাকে নিয়ে ছুটে জলের দিকে চলে গেল আর জামাই ছুটল ক্যামেরা হাতে ওদের পেছন পেছন। আর আমি ? বাবাগো বলে বুকে হাত দিয়ে ওদের দিকে পেছন ফিরে চেয়ারে বসে পরলাম। ভগবান আর কত পরীক্ষা নেবে?

চোখ বন্ধ করে বসেই আছি,ততক্ষণে এনারা গাইড-এর সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছেন। বিশেষ করে আমার নাতি, তিনি আবার হর্স রাইডিং জানেন, তাই তিনি কেরামতি দেখাতে আবারও জলে নামলেন গাইডের সঙ্গে। এবার আমার চিন্তা শুরু হলো ওর মা সঙ্গে নেই বলে। কিন্তু আমার তো জটায়ুর মত 'কোনো প্রশ্ন নয়' বলে বসে থাকতে হচ্ছে। চোখ বন্ধ অবস্থাতেই শুনলাম সবাই হাততালি দিচ্ছে। বুঝলাম আমার সবেধন নীলমণি নাতি শ্রীমান তিতাস যুদ্ধ জয় করে ফেরত এলেন। কী হাসি বাবা আর মায়ের। আর আমি একবারটি চোখ খুলে দেখেই আবার চোখ বন্ধ করলাম। খুব নরম করে জিজ্ঞেস করলাম এবার কি যাবি?

ঘোড়ার পিঠে সাগরে

মনে হলো মেয়ে মনে মনে বলছে-- কী বনানীদি, কেমন জব্দ?

এগারোই অগাস্ট,আর কোনো জায়গায় যাওয়া নয়,শুধু জাহাজে থাকো,খাও দাও আনন্দ কর। শপিংও কর ইচ্ছে মত। লোকেরা লাইন দিয়ে জিনিস কিনছে,হট টাবে বসে থাকছে ঘন্টার পর ঘন্টা,চারদিক জমজমাট। কত রকমের ভাষা। কত রকমের মানুষ। ওদের মন খারাপ,সন্তোষ দত্তর মত 'ছুটি ছুটি' বলে আনন্দ করতে পারছেনা। আর একদিন, তারপর ছুটি শেষ। আমার এই কয়েক দিনে অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা হলো। জলকে ভয় পাই ঠিক, কিন্তু যখন ব্যালকনিতে গিয়ে সমুদ্র দেখছি, তখন আর একটুও ভয় করছিলনা। ওই বিশাল জলরাশি, কিন্তু কী দারুণ গম্ভীর, দারুণ রাজকীয় সহজেই মাথা নীচু হয়ে যায়। প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়। বলতে ইচ্ছে করে -'ধন্য হলো,ধন্য হলো মানব জীবন'।

গ্র্যান্ড তুর্ক আইল্যান্ড

বিকেলে ম্যাজিক শো দেখলাম। রোজই খাবার সময় দেখেছি লোকটি এ টেবিল ও টেবিলে ম্যাজিক দেখাচ্ছে। কিন্তু এখন একটা পুরোদস্তুর ম্যাজিক শো হলো। ম্যাজিশিয়ান উড়িষ্যার লোক,ভালো বাংলা বলে। বেশ ভাব হয়ে গেছিল আমাদের সঙ্গে। বিশেষ করে আমার নাতির সঙ্গে তো খুবই ভাব হয়েছিল। কী অদ্ভুত জীবন - ছ' মাসের জন্যে সব কিছু ছেড়ে শুধু জলের ওপর থাকা।

বারোই অগাস্ট। বন্দরের কাল হলো শেষ। এবার ভিড়াও তরী। আবার সুটকেশ গোছাও জিনিসপত্র ব্যাগে ঢুকিয়ে নাও। যত পর খেয়ে নাও মনের সুখে। কোথায় একটা গয়না বিক্রি হচ্ছে, ব্যস, ছোটো সেখানে, অনেক গয়না কেনা হলো। কেনা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মনটা ঠিক নেই, রাত পোহালেই বাড়ি যাবার তাড়া।

রাত্রে ডাইনিং রুমে সবাইকে দেখে খুব মন খারাপ করতে লাগলো। আমার মেয়ে বহু কষ্টে কান্না সামলালো। ওদের সবার মুখগুলো এই আট দিনে খুবই পরিচিত হয়ে গেছিল। কে জানে আবার কখনো দেখা হবে কীনা, সবাইকে বিদায় জানিয়ে চলে এলাম, এই কটা দিন কেমন করে কেটে গেল বুঝতেই পারা গেলনা। মনে মনে সবাইকে বললাম 'তোমাদের ভালো হোক'।

বাই বাই কার্নিভাল স্প্লেনডর...উই উইল মিস ইউ...

জাহাজের নাম কার্নিভাল স্প্লেনডার

www.amaderchhuti.com

~ পুয়ের্তো রিকো, সেন্ট টমাস ও গ্র্যাণ্ড তুর্ক আইল্যাণ্ড ক্রুজের আরো ছবি ~

বনানী মুখোপাধ্যায় একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় শ্রুতি নাট্যকার। মধুসংলাপী নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের কন্যা হওয়ার জন্য শিশুকাল থেকেই নাটকের পরিবেশে মানুষ হওয়া। ইচ্ছে ছিল মঞ্চ অভিনেত্রী হওয়ার, কিন্তু হলেন নাট্যকার। হয়তো বিধাতার তাই ইচ্ছে ছিল। এই প্রথম ভ্রমন কাহিনি লেখা বনানীর।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

ছুটির আড্ডা

বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেষট্টি আমরা সবাই এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা ডাকে বা নির্দিষ্ট ফর্মে মেল করে পাঠালেই চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com

রহস্যময় আন্ধারমানিক

জিয়াউল হক শোভন

রনি ভাইয়ের ফোন পেয়েই চলে গেলাম তার বাসায়। গুগল ম্যাপে সে আমাকে দেখাল এক আশ্চর্য যায়গা, যার নাম লেখা "দ্য ব্ল্যাক ফরেস্ট", বান্দরবানের গহিন অঞ্চলে বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের সীমান্তে এর অবস্থান। ব্যাস, নড়েচড়ে বসলাম আমরা। একটু খোঁজখবর করতেই পেয়ে গেলাম "দ্য ব্ল্যাক ফরেস্ট" ওরফে "আন্ধারমানিক" সম্পর্কে তথ্য।

আন্ধারমানিকের পথে যাত্রা

২০০৮ সালে ডি-ওয়ে এক্সপেডিটর-এর সদস্যরা এই জায়গায় একটি অভিযান চালায়। সেটি ছিল বাংলাদেশেই উৎপত্তি হয়েছে এমন একমাত্র নদী, সাঙ্গুর উৎস সন্ধানের একটি অভিযান। পরবর্তীতে তারা এই অঞ্চল সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যের উন্মোচন করে। এই সার্থক অভিযানে তাঁরা উপভোগ করে গহিন সাঙ্গু রিজার্ভ ফরেস্ট এবং আন্ধারমানিকের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। প্রধানত তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং তথ্যের উপর নির্ভর করে ২০১১ সালের অক্টোবরে আমরা তিনজন - আমি, সম্রাট ভাই এবং রনি ভাই রওনা দিয়েছিলাম আন্ধারমানিকের উদ্দেশ্যে।

ঢাকা থেকে রাতের বাসে করে বান্দরবান, অতঃপর পরদিন বান্দরবান শহর থেকে লোকাল বাসে করে থানচি। সেখান থেকে গাইড হিসেবে আমাদের সাথে যাওয়ার কথা অভিজ্ঞ গাইড অং সাইয়ের। কিন্তু সে অসুস্থ থাকায় লোকাল গাইড লালমুন বম এবং দুই জন মাঝি সহ নৌকা ভাড়া করে আমরা রওনা দিলাম তিন্দুর উদ্দেশ্যে। গাইড এবং মাঝি সহ নৌকায় আমরা মোট পাঁচজন, সাথে ব্যাকপ্যাক এবং অন্যান্য সারঞ্জাম। পদ্ম ঝিরির মুখে এসে আমাদের নৌকার ইঞ্জিন নষ্ট হল। শেষমেশ সন্ধ্যার দিকে নিরাপদেই আমরা তিন্দু পৌঁছাই। সাঙ্গুর ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে সারাদিনের ক্লান্তি চলে গেল। পাথর দিয়ে চুলা বানিয়ে সাথে করে নিয়ে আসা চাল, ডাল, তেল এবং মশলা সহযোগে আমরা খিচুড়ি রান্না করতে বসে গেলাম। রাতে তাই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে সাঙ্গুর পাড়েই আমাদের তাঁবু ফেললাম। ঠিক হল গাইড সহ নৌকার মাঝিরা নৌকাতেই ঘুমাবে।

সেদিন ছিল ভরা পূর্ণিমা। নিছক শখের বসেই আমরা জ্যোৎস্নার আলোয় তিন্দু ঝিরি ধরে হাঁটা শুরু করি। হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের অজান্তেই অনেকদূর চলে গিয়েছিলাম। পাহাড়ি ঝিরি আর এর সাথে পিচ্ছিল পাথরে কতবার যে পড়েছিলাম, তার ঠিক নেই। তারপরও রোখ চেপে গিয়েছিল এই ঝিরির শেষ দেখে ছাড়ব। জ্যোৎস্নার আলোয় টর্চ লাইটের অভাবও আমরা বোধ করছিলাম না। একটা সময় ক্লান্ত হয়ে এবং পরদিন ভোরে ওঠার কথা মনে পড়ায় ফিরতি পথ ধরলাম। আসলে তিন্দুতে বর্তমানে অনেক পর্যটকরা গেলেও তিন্দু ঝিরির সৌন্দর্যের কথা অনেকেই জানেননা।

আন্ধারমানিকের প্রবেশপথ

পরদিন ভোরে মোরগের প্রথম ডাকেই আমাদের ঘুম ভাঙল। হাতমুখ ধুয়ে আগেরদিনের খিচুড়ির অবশিষ্টাংশ খেয়ে আমরা রওনা দিলাম বড় মদকের উদ্দেশ্যে। পথে বড়পাথর নামক অঞ্চলে বিশাল বিশাল পাথরের মাঝখানে নৌকার ইঞ্জিন বন্ধ করে লগি দিয়ে ঠেলে এবং বৈঠা বেয়ে খুব সাবধানে এগোতে হয়। এখানে রয়েছে প্রচুর ডুবোপাথর, যার সামান্য আঘাতেই নৌকা তলিয়ে যেতে পারে। সাঙ্গু নদীর আশি শতাংশ দুর্ঘটনাই এই অঞ্চলে হয়। নিরাপদে বড়পাথর পার হয়ে রেমাক্রি ছাড়িয়ে আমাদের নৌকা চলল বড় মদকের

উদ্দেশ্যে। পাহাড়ি নদীর প্রচণ্ড উজান স্রোত উপেক্ষা করে আমরা বড় মদক পৌঁছলাম। এখানে রয়েছে বেশ বড় একটি বিজিবি ক্যাম্প। সময়ের স্বল্পতায় বড় মদকে না থেমে আমরা এগিয়ে গেলাম আন্ধারমানিকের উদ্দেশ্যে। স্থানীয় ভাবে এটি "মুরং ওয়া" নামে পরিচিত। এখানে একটি পাড়া আছে যার নাম মুরং ওয়া পাড়া। বড় মদক থেকে নদীপথে এই পাড়ার দূরত্ব আট কিমি। এর পরেই শুরু হবে রহস্যময় সৌন্দর্যের জগৎ আন্ধারমানিক।

অজানা ঝরনায় পানি সংগ্রহ ও স্নান

ডি-ওয়ে এক্সপেডিটর এর সদস্যদের ভাষায় বলতে গেলে, "দীর্ঘ এই নদীপথের দুই পাশের পাহাড়ের দেয়াল খাড়া নেমে গেছে পানির গভীর তল পর্যন্ত। পাহাড়ের উঁচু উঁচু গাছ ভেদ করে সূর্যের আলো পৌঁছায় খুব কম। তাই এই জায়গার নাম আন্ধারমানিক। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বয়ে চলেছে অসংখ্য ঝরনা"।

সেইরকম একটি ঝরনার কাছে এসে আমাদের নৌকা থামালাম। এখান থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করা হলো এবং ঝরনায় গোসল করে আমরা শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর করলাম। ক্রমশঃ দেখতে পাচ্ছিলাম আন্ধারমানিকের অন্ধকার জগৎ নদীপথে সামনে এগিয়ে গেছে। এই রাস্তা লিক্রি পর্যন্ত গেছে। সেখান থেকে বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের সীমানা কাছেই। আমাদের ইচ্ছা ছিল লিক্রি পর্যন্ত পৌঁছে সাঙ্গু রিজার্ভ ফরেস্ট এবং সাঙ্গুর উৎস খ্যাত পানছড়া ঝিরি দেখে আসব। তাছাড়াও আন্তর্জাতিক ভাবে খ্যাত এখানে একটি হাতির ট্রেইল আছে।

কিন্তু এখানেই বাঁধল বিপত্তি, কোন এক অজানা কারণে আমাদের গাইড এবং তার সাথে নৌকার দুই মাঝি আর সামনে এগোতে রাজি হলো না। তাদেরকে আমরা যতই বোঝাই এবং টাকা পয়সা বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলি, কিন্তু কিছুতেই তারা আর সামনে এগোবে না। এদিকে নৌকা ছাড়া এই পথে এগোনো অসম্ভব। শেষে বাধ্য হয়েই আন্ধারমানিকের রহস্যময় অন্ধকারকে পিছনে ফেলে আমাদেরকে ফিরে আসতে হলো। দূর্বার ভাবে সেই পথ আমাদেরকে টানছিল আরও ভিতরে যাওয়ার, কিন্তু কিছু করার নেই। অং সাইয়ের কথা খুব মনে পড়ল, সে থাকলে হয়তো এই পরিস্থিতি হতো না, আমরা আরও ভিতরে যেতে পারতাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আবার আসব এখানে, এই অন্ধকার জগতের শেষ দেখে ছাড়ব। কিন্তু আজ দু' বছর হতে চললো, সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায় এখনও যাওয়া হলো না। সেই ব্যর্থ অভিযানের স্মৃতি এখনও জ্বলজ্বল করে চোখের সামনে।

তিন্দুতে আমাদের ক্যাম্পিং

www.amadershhuti.com

~ আন্ধারমানিকের তথ্য ~

ভ্রমণপ্রেমী জিয়াউলের স্বপ্ন সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে প্রকৃতি আর বিভিন্ন ধরনের মানুষের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

মন্দির-নগরীতে কিছুক্ষণ

রিমি মুৎসুদ্দি

আলেক্স রাদারফোরড আর উইলিয়াম ডালরিম্পল পড়ে ইতিহাসে মজেছিলাম। কিন্তু মুঘল স্মৃতির ছোঁয়া পেতে গেলে ছুটে যেতে হবে দিল্লি-আগ্রা। সেতো সময়ের ব্যাপার। এদিকে হপ্তাহান্তের এক ছুটিতে হঠাৎই জেগে উঠল ভ্রমণ পিপাসা। ইতিমধ্যে হাতে এসেছে অভয়পদ মল্লিকের "বিষ্ণুপুরের ইতিহাস-পশ্চিমবঙ্গের এক প্রাচীন সাম্রাজ্য"। আনুমানিক ৬৯৫ বঙ্গাব্দে রাজা আদিমল বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে মল্ল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ৩০০ বছর পরে মল্ল রাজা জগ্যমল্ল বিষ্ণুপুরের প্রচলিত মা মৃন্ময়ীদেবীর ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিষ্ণুপুরে মল্লরাজধানী স্থাপন করেন। এইসব পড়তে পড়তে মনে হল হাতের কাছেইতো বিষ্ণুপুর... ঘুরেই আসি।

শ্যামরায় মন্দির

রাজা বীরভদ্র ছিলেন মল্ল রাজবংশের শ্রেষ্ঠতম রাজা। তিনি মুঘলদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন এবং আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘলদের পাশে ছিলেন। বৈষ্ণব গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের সান্নিধ্যে এসে বীরভদ্র বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে এ এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এরপর তিনি বিষ্ণুপুরকে বৈষ্ণব ধর্ম ও স্থাপত্যের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন। পরবর্তী সময়ে বীর হাম্বীর, বীরসিংহ প্রমুখ মল্লরাজাদের আমলে প্রাচীন বঙ্গের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল বিষ্ণুপুর। বীরভদ্র এবং অন্যান্য মল্ল রাজাদের কল্যাণে বিষ্ণুপুর আজ 'পশ্চিমবঙ্গের মন্দির নগরী'। ল্যাটেরাইট অথবা ইঁটের উপর টেরাকোটার কাজ করা এই ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধগুলি এক অভূতপূর্ব ভারতীয় স্থাপত্যকলার সাক্ষী। যে স্থাপত্যরীতি বিষ্ণুপুরে সবচেয়ে সমাদৃত তাকে একবর্তনী শৈলী বলা হয়। বাঁকানো কার্নিসযুক্ত দেওয়াল ও ইষৎ ঢালু ছাদের কেন্দ্রে একটিমাত্র চূড়ার বিন্যাস এই রীতির বৈশিষ্ট্য। বিষ্ণুপুরে উল্লেখযোগ্য মন্দিরের সংখ্যা তিরিশের নীচে হবে না। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি দেউল, চালা, রত্ন প্রভৃতি স্থাপত্যগত দিক থেকে পৃথক পৃথক পর্যায়ে ভাগ করা যায়। সবচেয়ে বিখ্যাত জোড়বাংলা মন্দির। মল্লেশ্বর, মদনমোহন, জোড়বাংলা, মুরলীমোহন, শ্যামরায় মন্দিরগুলি ইঁটের তৈরি। কালাচাঁদ, লালজী, মদনগোপাল, রাধামাধব, রাধাগোবিন্দ, রাধাশ্যাম, নন্দলাল মন্দিরগুলি ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত। মন্দিরগুলিতে পোড়ামাটির অপরূপ ভাস্কর্যে ফুটে উঠেছে দেব-দেবী, সমাজজীবন, ফুল-লতা-পাতা,পশুপাখির নানান মোটিফ। শুধু অসাধারণ স্থাপত্যই নয়, রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীতজগতে যে বিশিষ্ট ঘরানার একদা সৃষ্টি হয়েছিল তার ধারা আজো অম্লান। সঙ্গীতাচার্য যদুভট্টের জন্মস্থানও এই বিষ্ণুপুর।

দুর্গাপুর থেকে গাড়িতে আড়াই ঘণ্টা ড্রাইভ করে পৌঁছে গেলাম 'পশ্চিমবঙ্গের মন্দির নগরী' বিষ্ণুপুরে (কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বাসে করেও যাওয়া যায়। পুরুলিয়া এক্সপ্রেস, রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস, আরণ্যক এক্সপ্রেস-এই ট্রেনগুলি হাওড়া থেকে ছাড়ে। ট্রেনে সময় লাগে প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা)। একজন গাইড ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হল আমাদের যাত্রা। পাঁচ টাকা দিয়ে প্রবেশপত্র কিনতে হল। এতে রাসমঞ্চ, জোড়বাংলা(কেষ্ট-রাই) মন্দির আর শ্যাম-রাই মন্দির দেখে নেওয়া যাবে। বিষ্ণুপুরের গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরগুলি আরকিওলজিকল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া দ্বারা সংরক্ষিত। ট্যুরিস্টদের থেকে মেনটেন্যান্স ফি হিসেবেই এই টাকাটা নেওয়া হয়। এই মন্দিরগুলো প্রত্যেকটিই এক একটা অসাধারণ শিল্পরীতির সাক্ষর বহন করে।

www.amaderchhuti.com

ভ্রমণ শুরু হল রাসমঞ্চ থেকে। রাসমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বীর হাম্বীর (১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ)।এটা ভারতের প্রাচীনতম পোড়ামাটির মন্দির। ইটের ওপর সূক্ষ্ম কারুকাজ করা এই মঞ্চটি বর্তমানে একটি স্মৃতিসৌধ। শোনা যায় এই ভুলভুলাইয়ায় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাস উৎসব পালন করা হত।

বিষ্ণুপুরের অন্যতম আকর্ষণ জোড়বাংলা(কেষ্ট-রাই) মন্দির আমাদের পরবর্তী গন্তব্য। মল্ল রাজা রঘুনাথ সিং ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। ক্লাসিকাল চালা শিল্পরীতি অনুযায়ী নির্মিত এই মন্দিরটি। এটি দেখলে মনে হবে দুটো কুঁড়েঘর একটা ছাদ আর দেওয়াল দিয়ে জোড়া। এর গাত্রে খোদিত টেরাকোটার কাজ অসাধারণ। তৎকালীন রাজাদের কীর্তি রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী বর্ণিত আছে এই টেরাকোটার কাজে ছবির মাধ্যমে।

টেরাকোটার কারুকাজ সমৃদ্ধ শ্যাম-রাই মন্দির ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মল্ল রাজা চৈতন্য সিং প্রতিষ্ঠা করেন। ডোম আকৃতির শিখর যুক্ত মন্দিরটির গায়ে পুরাণের কাহিনি অঙ্কিত আছে। দক্ষিণমুখী মন্দিরটির দেওয়ালে অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও গণেশাদি দেবতা, হাতি, ঘোড়া, মহিষ, হরিণ ইত্যাদি পশুপাখি, নরনারী প্রভৃতি পোড়ামাটির মূর্তিদ্বারা সুন্দরভাবে অলংকৃত। শ্রী কৃষ্ণ এই মন্দিরের আরাধ্য দেবতা।

টেরাকোটার কারুকাজ

এরপর আমরা গেলাম দুর্গের দিকে। পথে পড়ল গুমঘর। এটাই ছিল মল্ল রাজাদের আমলে কয়েদখানা। এরপর এল দুর্গের দরজা। দরজা দিয়ে প্রবেশ করে দেখলাম একটা ছোটো জলাধার। একে বলে মোর্চা হিল।এখানে দুর্গাপূজোয় কামান দাগা হত। আর একটু এগিয়ে দেখলাম পাথরের রথ। এটি ল্যাটেরাইট পাথরে তৈরী। পরের গন্তব্য লালজি মন্দির আর রাধেশ্যাম মন্দির। রাজা বীরসিংহ কর্তৃক ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত লালজি মন্দিরটি বাঁকুড়া জেলার চারচালা একচূড়া মন্দিরগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ৫৪ বর্গফুটের ভিত্তিবেদির ওপর প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী মন্দিরটির পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে তিনটি করে তোরণযুক্ত প্রবেশ পথ ও সংলগ্ন দালান আছে। চূড়ার নীচের খাড়া অংশের চারদিকে চারটি খিলানযুক্ত অলিন্দ ও সাতটি করে পঙ্খ আছে আর উপরের অংশে কার্নিসের প্রয়োগ, পীঢ়া দেউলদীর্ঘ আকৃতি এবং অলংকরণ মন্দিরটিকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে।

শহরের জলাভাব মেটাতে মল্লরাজ বীরসিংহ বিষ্ণুপুরে অনেকগুলি দীঘি খনন করেন। লালবাঈ-এর গল্পকথা জড়িয়ে রয়েছে বিখ্যাত লালবাঁধকে ঘিরে। লালবাগ একটি স্মৃতি উদ্যান। কোনো এক মল্ল রাজা তাঁর মুসলমান স্ত্রী লালবাঈ-এর উদ্দেশে এই উদ্দ্যানটি নির্মাণ করান। লালবাগ থেকে আমরা গেলাম দলমাদল কামান আর ছিন্নমস্তা মন্দির দেখতে। দলমাদল কামান এক ঐতিহাসিক সাক্ষী বহন করছে। কথিত আছে রাজা গোপাল সিংহ-এর আমলে গৃহদেবতা মদনমোহন স্বয়ং এই কামানের সাহায্যে বর্গী আক্রমণ রুখেছিলেন। ছিন্নমস্তা মন্দিরটি প্রায় একশ বছর পুরোনো। নিয়মিত এখানে পুজো হয় ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলে।

এবার ফেরার পালা। তার আগে অবশ্য ইতিহাস থেকে বাস্তবে ফিরে হোটেল মেঘমল্লারে পোস্তর বড়া দিয়ে জমিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম।

অর্থনীতি ও প্রবন্ধন (ম্যানেজমেন্ট) বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং ব্যাঙ্গালোরের আচারিয়া ও ক্রাইষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা রিমি বর্তমানে দুর্গাপুরের ম্যানেজমেন্ট কলেজে আংশিক সময়ে পড়ান। বই পড়া, ছোটোখাটো লেখালেখি করা, গুছিয়ে সংসার করা ছাড়াও ঘুরে বেড়ানোর সখ।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

ইচ্ছে হল

দেবশ্রী ভট্টাচার্য

"খুদ্ হি পেশ কর্ বুলন্দ ইতনি
কি খুদা খুদ্ বন্দে সে পুছে
বতা তেরা রজা কেয়া হ্যায়।।"

বরফের পাহাড় দেখব। এই ইচ্ছাতো মনের মধ্যে জমে উঠেছে কতদিনই। না দূর থেকে নয়, হাত দিয়ে ছুঁয়ে, ছুঁয়ে, অনুভবে। কত পাহাড়ইতো দেখলাম, গাছে ঢাকা সবুজ পাহাড়, রুক্ষ পাথুরে পাহাড়, দূর থেকে দেখা বরফের পাহাড়... আশ মেটে কই?
গ্যাংটকে পৌঁছে দেখলাম আমাদের হিসেবটা একেবারে নির্ভুল - কাটাও, ইয়ুমথাং, লাচুং কোথাও যেতে হবে না, ছাংগুতেই অনেক বরফ। কিন্তু তাতো হল, বরফে ঢাকা পথে যাওয়ার অনুমতি মিলবেতো, এবারে সেই চিন্তা শুরু হল।
এখানে পৌঁছানোর পর থেকেই টিপ টিপ বৃষ্টি আমাদের সঙ্গী হয়েছিল। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই সামনের এম জি মার্গে হাঁটতে বেরোলাম। আকাশে সাদা-কালো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। এখানে বৃষ্টি মানে ছাংগুতে নিশ্চয় বরফ পড়ছে। মনে মনে আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে লাগলাম। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার সাব দরকারি কাগজপত্র নিয়ে পারমিটের ব্যবস্থা করতে গেছেন।
পরদিন সকালে বেরোনোর জন্য সবাই প্রায় তৈরি হয়েই গেছি, তখনই ফোন এল ছাংগু যাওয়ার পারমিট দেওয়া হচ্ছে না। অগত্যা গ্যাংটক সাইট সিয়িং। এদিন তবু ঘুরে বেরিয়ে কাটল। পরেরদিন আকাশের যা অবস্থা সারাদিন আমরা হোটেলের ঘরেই বন্দী থাকলাম। বিকেল বেলার দিকে মেঘগুলো আমাদের দুঃখী দুঃখী মুখ দেখে বোধহয় জানলার কাছে নেমে এসেছিল। খানিকক্ষণ মেঘের সঙ্গে খেলা করেই বেশ কাটল।
তবে মনে হয় খুব মন দিয়ে কিছু চাইলে সেটা অবশ্যই পাওয়া যায়। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে আকাশের ঝলমলে চেহারাটা দেখে সেই কথাটাই মনে হল। আমাদের মুখও আকাশের মতই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ফোন করে জানা গেল এদিনও পারমিট পাওয়া যাবেনা - মিলিটারি রাস্তা পরিস্কার করবে। আগামীকাল বেরোনো একেবারে পাক্কা। দুদিন যখন অপেক্ষা করতে পেরেইছি, তাহলে আর একদিনেই কীবা যায় আসে। আবহাওয়া পরিস্কার থাকায় সারাদিনটা আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েই দিব্যি কেটে গেল।

বরফে ঢাকা ছাঙ্গু লেক

পরদিন সকালবেলায় ঝলমলে রোদ্দুর মাখা পথে আমাদের গাড়ি পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল - মনে হল যেন অনন্ত প্রতীক্ষার শেষ হল। রওনা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফের দেখা মিলল। প্রথমে পাথরের খাঁজে খাঁজে সাদা চুনের ডেলার মত, কখনওবা পাহাড়ের গা দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, ঝুলছে পাহাড়ের গা বেয়েই। আরেকটু এগিয়ে দেখি যেদিকে দুচোখ যায় সবটাই সাদা - পাহাড়ের মাথা থেকে রাস্তা, পাহাড়ি ঘরগুলির ছাদ পর্যন্ত - যেন শ্বেত বসনা দেবী সরস্বতী বসে আছেন শ্বেত হংসের ওপরে।
ছাংগুতে পৌঁছে দেখি পুরো লেকটাই জমে বরফ হয়ে গেছে। আশেপাশে ঘুরে বেরাচ্ছে চমরী গাইয়ের দল। মাত্র তিন-চার ঘন্টার মধ্যেই ৪,৫০০ ফুট উচ্চতা থেকে একেবারে ১০,৫০০ ফুট উচ্চতায় উঠে এসেছি। আমার ছ'বছরের ছেলের মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম ওর কষ্ট হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ওষুধপত্র খাইয়ে চাঙ্গা করে আবার রওনা দিলাম।

www.amader-chhuti.com

চমরী গাই

এবার লক্ষ্য ভারত-চিন সীমান্তে নাথুলা আর ফেরার পথে বাবা মন্দির। পাহাড়ের গা বেয়ে কিছুটা পথ এগোতেই আর্মি পথ আটকালো - আমাদের কাগজপত্র পরীক্ষা হবে। সেখানেও আবার আর এক বিপত্তি - আমরা খেয়ালই করিনি যে সবারই বয়স অবিশ্বাস্যরকম ভুল লেখা ছিল। আর্মির জওয়ানটি একটুক্ষণ আমাদের সকলের দিকে বিস্ময়ে ভরা অবাক চোখে তাকিয়ে নেহাত বিরক্ত হয়েই বলল - ঠিক করকে লিখিয়ে। গাড়ির ড্রয়ার হাটকে একটা ভাঙ্গা পেন পাওয়া গেল, তাই দিয়েই কোনমতে কাজ চালানো হল। কিন্তু হায় এত করেও শেষ রক্ষা হল না। হঠাৎ গাড়ি আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখি শুধু আমাদের গাড়িই নয়, সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। সামনের রাস্তা বরফে-কাদায় মাখামাখি। চেষ্টা করেও গাড়ি আর এগোনো গেল না। অগত্যা নেমে পড়ে হাঁটার উদ্যোগ নিলাম। মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে নাথুলা। এত কাছে এসেও ফিরে যেতে হবে? রাস্তা বেশ পিছল তা হাঁটতে গিয়েই টের পেলাম। আরও ওপরে পৌঁছালে কীহবে কে জানে! তার ওপরে কয়েকটা গাড়ি ব্যাক গিয়ারে যখন ওঠার চেষ্টা করছে তখন আর হাঁটার জায়গাই থাকছে না। বিপদ বুঝে অ্যাডভেঞ্চারের আশা ত্যাগ করলাম।

ফেরার পথে পৌঁছালাম বাবা মন্দিরে। বাবা হরভজন সিং ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক জওয়ান। ১৯৬৫ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের সময় কর্মরত অবস্থাতেই হিমবাহের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। হরভজন সিংকে নিয়ে নির্জন এই পাহাড়ি অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে নানান উপকথার কাহিনি। এখানকার সেনা জওয়ানেরা বিশ্বাস করেন যে আজও তিনি তাঁদের পাহারা দেন, আপদে-বিপদে পাশে দাঁড়ান। বাবা এখনও সরকারি বেতন আর ছুটি পান। বছরের কিছুটা সময় তাঁর ব্যবহৃত জামাকাপড় নিয়ে যাওয়া হয় পাঞ্জাবে তাঁর বাড়িতে, আবার নির্দিষ্ট সময়ে ফিরিয়ে আনা হয়।

এসব শুনতে শুনতে সত্যি যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মন্দিরে ঢুকে দেখি একপাশে সুন্দর করে একটা ক্যাম্পখাট পাতা, খাটের ওপরে বাবা হরভজন সিং-এর ইউনিফর্ম রাখা আছে। মাটিতে একপাশে রয়েছে পালিশ করা বুটজোড়া। প্রসাদ নিয়ে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। ফিরে এলাম ছাংগুতে।

এখানে এসে সবাই দারুণ খুশি। আমাদেরই মত নাথুলা দেখতে না পেয়ে ফিরে আসা পর্যটকে জায়গাটা ততক্ষণে বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। এতদিনের অপেক্ষার পর হাতের কাছে অঢেল বরফ পেয়ে খানিকক্ষণ আমরা বড়রাও যেন আবার ছোট হয়ে গেলাম - বরফ ছোঁড়াছুঁড়ির খেলা চলল। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে নীচে নামার রাস্তা ধরলাম।

ফিরে যেতে যেতে একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছিল - ঈশ্বরের সব সৃষ্টিই সমান সুন্দর। বরফের পাহাড় দেখে আজ সত্যিই খুব আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু তাতে আমার এতদিনের অন্য সব দেখা, অন্য পাওয়া কোনটাই কমে যায়নি। যতদিন বেঁচে আছি দুচোখ ভরে তাঁর সব সৃষ্টি দেখতে চাই। যদি কোনদিন দেখা হয় সেই শিল্পীর সঙ্গে যেন বলতে পারি সেই অপূর্ব অনুভূতির কথা।

একটা ইচ্ছাপূরণের মনভরা আনন্দ যেন এই মুহূর্তে আরও বড় আর একটা ইচ্ছের জন্ম দিল।

~ গ্যাংটক-ছাঙ্গু লেকের তথ্য ~

www.amaderchhuti.com

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর দেবশ্রী ছোটবেলা থেকেই লিখতে ভালোবাসেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । কেদার ও গঙ্গোত্রী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা প্রথম বই 'পাহাড়ের গান' প্রকাশিত হয় ২০১১ সালের বইমেলায়।

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন